দেখার দৃষ্টিভঙ্গি

জন বার্জার

অনুবাদ : কাজী মাহবুব হাসান, আসমা সুলতানা

Ways of Seeing

based on the BBC television series with

John Berger

Translated by:

Asma Sultana
Kazi Mahboob Hassan

দেখার দৃষ্টিভঙ্গি

বিবিসি টেলিভিশনে প্রচারিত প্রামাণ্য ধারাবাহিক অনুসারে

জন বার্জার

অনুবাদ:

আসমা সুলতানা
কাজী মাহবুব হাসান

সুপ্রজ্ঞা অনুবাদ উদ্যোগ, ২০২৪

সুপ্রজ্ঞা
অনুবাদ উদ্যোগ

সূচি

অনুবাদকের ভূমিকা
মূল লেখকের ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুর্থ অধ্যায়
পঞ্চম অধ্যায়
ষষ্ঠ অধ্যায়
সপ্তম অধ্যায়

মূল লেখকের ভূমিকা

এই বইটি লিখেছি আমরা পাঁচজন (জন বার্জার, এস'ভেন ব্লুমবার্গ, ক্রিস ফক্স, মাইকেল ডিব, রিচার্ড হলিস)। আমাদের সূচনা বিন্দু ছিল টেলিভিশন প্রামাণ্য ধারাবাহিক 'ওয়েজ অব সিইং'-এর অন্তর্গত কিছু ধারণা। সেই ধারণাগুলোকে আমরা আরো বর্ধিত আর বিস্তারিত একটি রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। আর সেই ধারণাগুলো, আমরা কী বলতে চাইছি শুধু তাই নয়, আমরা কীভাবে তা বলবার চেষ্টা করছি সেই বিষয়টিকেও প্রভাবিত করেছে। বইটির সংগঠন আর উপস্থাপনা, এই বইয়ে প্রস্তাবিত সব যুক্তির মতো, আমাদের উদ্দেশ্যরই অংশ।

বইটিতে সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত মোট সাতটি প্রবন্ধ আছে। যে-কোনো অনুক্রমেই পাঠকরা সেই অধ্যায়গুলো পড়তে পারেন। মোট চারটি অধ্যায়ে আমরা শব্দ এবং চিত্র ব্যবহার করেছি, অন্য তিনটি অধ্যায় শুধু চিত্র সম্বলিত। চিত্র ব্যবহার করে এই রচিত প্রবন্ধগুলোর (নারীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি এবং তৈলচিত্রের প্রথাগত ধারার বেশ কিছু স্ববিরোধী বিষয়সংক্রান্ত) উদ্দেশ্য হচ্ছে, শব্দ আর চিত্র ব্যবহার করে লেখা অন্য প্রবন্ধগুলোর মতোই পাঠকের মনে সমসংখ্যক প্রশ্নের জন্ম দেয়া। কখনো কখনো চিত্র সম্বলিত প্রবন্ধগুলোয় ব্যবহৃত পুনর্মুদ্রিত চিত্রগুলো সম্বন্ধে কোনো তথ্য উল্লেখ করা হয়নি , কারণ আমাদের মনে হয়েছে এই ধরনের কোনো তথ্য, সেখানে উত্থাপিত মূল বিষয়গুলো থেকে পাঠকের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারে। তবে যা-ই হোক, সেখানে ব্যবহৃত সব চিত্রগুলো সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে এই বইয়ের শেষাংশে সংযোজিত 'পুনর্মুদ্রিত চিত্রকর্মের তালিকা' থেকে।

বইটির কোনো প্রবন্ধ একটি বিষয়ের নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ ছাড়া বাড়তি কিছু নিয়ে আলোচনা করার কোনো ভণিতা করেনি: সুনির্দিষ্টভাবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, আধুনিক ঐতিহাসিক সচেতনতা যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয় করে তুলেছে। প্রশ্ন করার একটি প্রক্রিয়া শুরু করাই ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য।

প্রথম অধ্যায়

শব্দের ব্যবহার শুরু করার আগে আমরা দেখতে শিখি। একটি শিশু কথা বলতে পারার আগে দেখতে আর চিনতে শেখে।

কিন্তু আরো একটি অর্থ আছে, যেখানে দেখা শব্দের আগে আসে। আর এই দেখা বা দর্শনই চারপাশের পৃথিবীতে আমাদের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করে। শব্দ ব্যবহার করে আমরা সেই পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করি, কিন্তু আমরা যে এর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছি সেই বাস্তব সত্যটিকে শব্দ কখনো বাতিল করতে পারে না। আমরা যা দেখি আর আমরা যা জানি এ দুটির মধ্যে সম্পর্ক সর্বদা অমীমাংসিত রয়ে যায়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা 'দেখি ' সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আমরা 'জানি' যে পৃথিবী সূর্যের দিক থেকে অন্যদিকে পাশ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তারপরও এই জ্ঞান, এই ব্যাখ্যা, কখনোই সূর্যাস্তের দৃশ্যের সাথে ঠিক মানানসই বলে মনে হয় না। পরাবাস্তববাদী শিল্পী রেনে ম্যাগ্রিট শব্দ আর কোনো কিছু দেখার মধ্যে চিরন্তন-উপস্থিত এই ব্যবধান নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন 'দ্য কি অব ড্রিমস' নামক তার একটি চিত্রকর্মে।

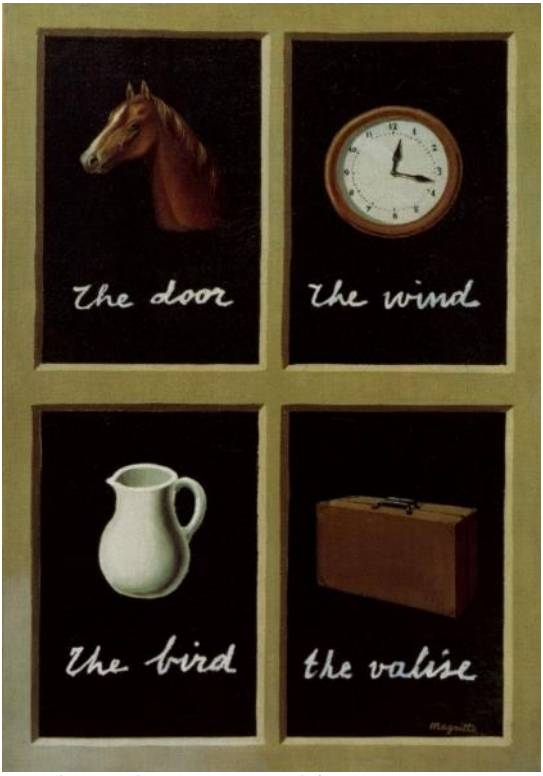

(দ্য কি অব ড্রিমস, রেনে ম্যাগ্রিট – ১৮৬৮ -১৯৬৭)

আমরা কোনো কিছু যেভাবে দেখি, সেটি আমরা যা জানি বা যা বিশ্বাস করি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। মধ্যযুগে মানুষ যখন নরকের বাস্তব অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো, সেই সময়ে আগুনের দৃশ্যের অর্থ বর্তমানে এর যা অর্থ, তার থেকে অবশ্যই খুব ভিন্ন ছিল। তবে যা-ই হোক, নরকের ধারণাটি, আগুনের লেলিহান শিখার কিছু গ্রাস করা ও অবশিষ্ট রয়ে যাওয়া ভস্মের দৃশ্য, এছাড়া তাদের দগ্ধ হবার যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার কাছেও অনেকাংশেই ঋণী।

ভালোবাসায়, প্রিয় মানুষটিকে দেখার মধ্যে যে পরিপূর্ণতা আছে, কোনো শব্দ বা কোনো আলিঙ্গন, তার সমতুল্য হতে পারেনা: শুধু সঙ্গমক্রিয়াটি সাময়িকভাবে সেই পরিপূর্ণতার বিকল্প হতে পারে।

তারপরও এই যে দেখা বা দর্শন, যা শব্দের আগেই আসে এবং যা কখনো শুধু শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায় না, তা কিন্তু যান্ত্রিকভাবে শুধু কোনো উত্তেজনার প্রতি প্রতিক্রিয়া নয়। (আর এমন ভাবে ভাবা কেবল সম্ভব হতে পারে যদি কেউ এটিকে আমাদের চোখের রেটিনা সংশ্লিষ্ট একটি প্রক্রিয়ার ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে শনাক্ত করে) । আমরা কেবল সেটাই দেখতে পাই, যার দিকে আমরা তাকাই। আর তাকানো আমাদের ইচ্ছার অধীনস্থ একটি কাজ। এবং এই ক্রিয়ার পরিণতিতে আমরা যা দেখি তা নাগালের মধ্যে চলে আসে, যদিও অবশ্যই আমাদের হাতের নাগালের মধ্যে নয়। কোনো কিছু স্পর্শ করা মানে, সেটির সাপেক্ষে আমাদের নিজেদের অবস্থানকে চিহ্নিত করা। (চোখ বন্ধ করুন, এভাবে ঘরের মধ্যে হাঁটাচলা করবার চেষ্টা করুন, লক্ষ করুন, কীভাবে আমাদের কোনো কিছুকে স্পর্শ করার ক্ষমতা বা স্পর্শেন্দ্রিয় স্থির ও সীমিত দৃষ্টিক্ষমতার মতো) আমরা কখনোই শুধু একটি জিনিসের দিকে তাকাই না। আমরা সর্বক্ষণই বিভিন্ন জিনিস আর আমাদের নিজেদের মধ্যকার সম্পর্কের দিকে তাকাই। আমাদের দৃষ্টি অবিরাম সক্রিয়, অবিরাম গতিশীল, অবিরাম এর চারপাশের বৃত্তের মধ্যে আটকে রাখে সবকিছু, আমাদের জন্য তৈরি করে, যা আমাদের কাছে বর্তমান, যেমন আমরা।

দেখতে সক্ষম হবার পরপরই আমরা সচেতন হয়ে উঠি, কারণ আমাদেরকেও দেখা যেতে পারে। অন্যদের চোখ, আমাদের নিজেদের চোখের সাথে সংযুক্ত হয়ে আমরা যে দৃশ্যমান জগতের অংশ সেই বিষয়টি পুরোপুরিভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।

যদি মেনে নেই দূরের ঐ পাহাড় আমরা দেখতে পারছি, সেই ক্ষেত্রে আমরা এমন প্রস্তাব করছি যে, সেই পাহাড়ের উপর থেকে আমাদেরকেও দেখা যেতে পারে। কোনো উচ্চারিত সংলাপের চেয়ে এই পারস্পরিক দেখার প্রক্রিয়াটি অনেক বেশি মৌলিক। এবং প্রায়শই উচ্চারিত সংলাপ হচ্ছে এই বিষয়টিকে ভাষায় প্রকাশ করার একটি প্রচেষ্টা, হয় রূপকার্থে নয়তো আক্ষরিকার্থে ব্যাখ্যা করার একটি প্রচেষ্টা - কীভাবে, 'আপনি কিছু দেখছেন' এবং একই সাথে কীভাবে 'তিনি কিছু দেখছেন' সেই বিষয়টি উদঘাটনের প্রচেষ্টা।

এই বইয়ে যে অর্থে আমরা 'চিত্র' (বা ইমেজ) শব্দটা ব্যবহার করেছি, সেই অর্থে সব চিত্রই মানবসৃষ্ট।

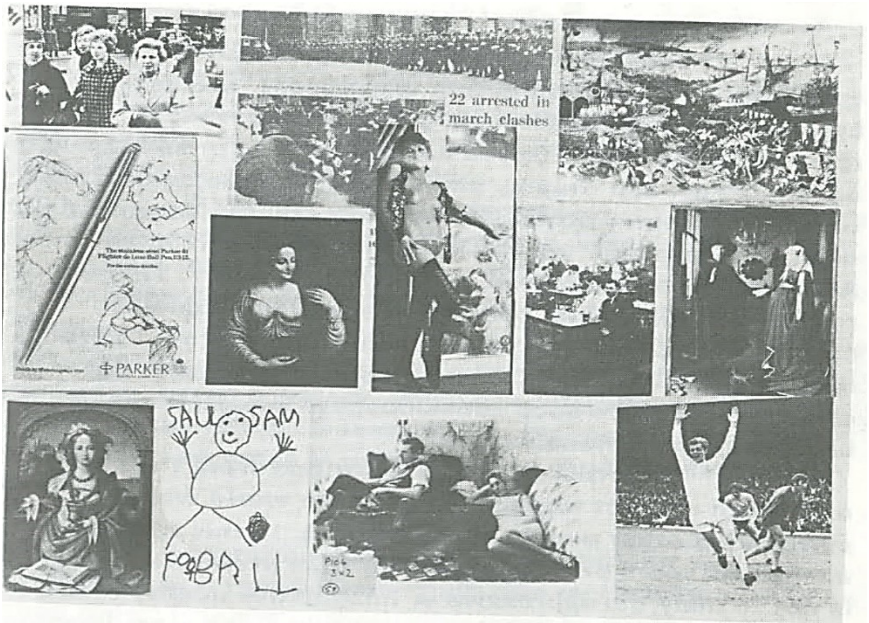

একটি চিত্র হচ্ছে একটি দৃশ্য যা পুনঃসৃষ্টি বা পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে। এটি দৃষ্টিগোচরতা বা একগুচ্ছ দৃষ্টিগোচরতা, যা সেই স্থান ও কাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যেখানে সেগুলো প্রথম দৃষ্টিগোচর এবং হয়তো কয়েক মুহূর্ত বা কয়েক শতাব্দীর জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। প্রতিটি চিত্রই দেখার একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিনিধিত্ব করছে। এমনকি একটি আলোকচিত্রও। প্রায়শই যা মনে করা হয়, আলোকচিত্র যান্ত্রিক কোনো দলিল নয়। যখনই আমরা কোনো আলোকচিত্রের দিকে তাকাই, আমরা বুঝতে পারি, যত সামান্যই হোক না কেন, আলোকচিত্রটির শিল্পী অনন্ত সংখ্যক সম্ভাব্য দৃশ্য থেকে সেই একটি মাত্র দৃশ্যকে তার ক্যামেরায় ধারণ করেছেন। এমনকি খুব সাধারণ পারিবারিক কোনো আলোকচিত্রের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সত্য। আলোকচিত্রীর দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তার বিষয়বস্তু নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়। আর কোনো চিত্রশিল্পীর দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, কাগজ বা ক্যানভাসে তার সৃষ্ট রেখার বা আঁচড়ের মাধ্যমে পুনঃসৃষ্টি করা হয়। যদিও প্রতিটি চিত্র একটি নির্দিষ্ট দেখার পদ্ধতিকে প্রতিনিধিত্ব করছে ঠিকই, কিন্তু সেই চিত্রটির প্রতি আমাদের উপলব্ধি অথবা মূল্যায়ন আমাদের নিজস্ব দেখার পদ্ধতির উপরেও নির্ভর করে। (যেমন ধরুন, কোনো আলোকচিত্রে 'শিলা' হয়তো বিশ জন পাত্রপাত্রীর একজন, কিন্তু আমাদের একান্ত নিজস্ব কোনো কারণে তার প্রতি আমাদের বিশেষ আগ্রহ আছে)।

অনেকটা যেন জাদুবলে, অনুপস্থিত কোনো দৃশ্যকে দৃষ্টিগোচরে আনতে চিত্র বা ইমেজ প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল। ক্রমান্বয়ে এটি স্পষ্ট হয় যে, কোনো একটি চিত্র যার প্রতিনিধিত্ব করছে, তার চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী। তারপর এটি প্রদর্শন করে, কোনো কিছু বা কোনো ব্যক্তি একসময় কেমন দেখতে ছিল এবং এভাবে সেই অর্থেই এটি প্রতিনিধিত্ব করছে কোনো এক সময় এই বিষয়বস্তুটিকে অন্য মানুষরা কীভাবে দেখতেন।

পরবর্তীতে সেই চিত্রনির্মাতার নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিও এই চিত্রটির প্রামাণ্য দলিলের অংশ হিসেবে শনাক্ত করা হয়। এইভাবে একটি চিত্র, কীভাবে 'ক', 'খ'-কে দেখতেন তারও প্রামাণ্য দলিলে রূপান্তরিত হয়। ক্রমবর্ধিষ্ণু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসংক্রান্ত সচেতনতাবোধের পরিণতি ছিল এটি, আর এছাড়াও এর সাথে যুথবদ্ধ হয়েছিল ক্রমবর্ধিষ্ণু ইতিহাস-সচেতনাবোধ। অপরিণামদর্শিতা হতে পারে, যদি এইমাত্র উল্লেখিত পর্যায়টি ঠিক কখন ঘটেছিল তার একটি নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করবার কোনো প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে ইউরোপে রেনেসাঁর সেই সূচনালগ্ন থেকেই এই সচেতনতার অস্তিত্ব ছিল।

অতীতের আর কোনো প্রকারের প্রাচীন ভগ্নাবশেষ কিংবা লেখ্য প্রমাণ নেই, যা কিনা এই উপায়ে প্রত্যক্ষভাবে সেই পৃথিবী সম্বন্ধে তথ্যের যোগান দিতে পারে, অন্য কোনো এক সময়ে যা অন্য পাত্রপাত্রীদের পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল। এইক্ষেত্রে চিত্র, সাহিত্যের তুলনায় আরো বেশি সুনির্দিষ্ট এবং সমৃদ্ধ। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, এটিকে কেবল প্রামাণিক দলিল হিসেবে ব্যবহার করবার মাধ্যমে শিল্পকলার অভিব্যাক্তিময়তা এবং কল্পনাপ্রবণতার গুণাবলি অস্বীকার করা হচ্ছে। কোনো শিল্পকর্ম যত বেশি কল্পনাপ্রবণ হয়, শিল্পীর দৃশ্যমান জগতের অভিজ্ঞতা অনুধাবন করতে এটি তত গভীরভাবে আমাদের সুযোগ করে দেয়।

তারপরও যখন কোনো চিত্র একটি শিল্পকর্ম হিসেবে উপস্থাপিত হয়, এবং যেভাবে কেউ সেই শিল্পকর্মের দিকে তাকায়, সেটি শিল্পকলা সম্বন্ধে তাদের আগেই শেখা কিছু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একগুচ্ছ পূর্বধারণার উপর নির্ভরশীল। যেমন, নিচের বিষয়গুলো সংক্রান্ত পূর্বধারণা:

সৌন্দর্য
সত্য
প্রতিভা
সভ্যতা
রূপ
সামাজিক মর্যাদা
রুচিবোধ, ইত্যাদি।

এইসব পূর্বধারণার অনেকগুলোই, পৃথিবী এখন যেমন, তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। (পৃথিবী-এখন-যেমন-তেমন বিশুদ্ধভাবে বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব সত্যের থেকেও আরো বেশি কিছু বোঝায়, সচেতনাতাবোধও এর মধ্যে অন্তভুর্ক্ত)। বর্তমানের সত্যের সাথে বৈসাদৃশ্যময় এই সব পূর্বধারণাগুলো অতীতকে অস্পষ্ট করে তোলে। অতীতকে স্পষ্টতা দেবার বদলে এটি আরো রহস্যময়তায় আবৃত করে। অতীত আসলে ঠিক কী, সেটি কোনো একদিন আবিষ্কৃত হবে বা স্বীকৃতি পাবে এমন প্রত্যাশায় কখনো অপেক্ষা করে থাকে না। ইতিহাস সবসময়ই কোনো একটি বর্তমান এবং এর অতীতের মধ্যে সম্পর্ক নির্মাণ করে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানের প্রতি শঙ্কা অতীতকে রহস্যাবৃত করবার পথটি প্রশস্ত করে দেয়। অতীত বসবাস করবার জন্য নয়; এটি অসংখ্য উপসংহারে সমৃদ্ধ একটি খনি, পরবর্তী কোনো পদক্ষেপ তিনি যেখান থেকে আমরা তথ্য সংগ্রহ করি। অতীতের উপর আরোপিত

এই সাংস্কৃতিক রহস্যময়তা দ্বিগুণ পরিমান ক্ষতির দায়ভার চাপিয়ে দেয়। অপ্রয়োজনীয়ভাবেই শিল্পকর্মগুলোকে অস্পৃশ্য করে তোলা হয়। এবং কোনো কাজ সম্পন্ন করতে অতীত আমাদের অপেক্ষাকৃত কম উপসংহার নিবেদন করে।

আমরা যখন কোনো ল্যান্ডস্কেপ বা ভূদৃশ্য চিত্র 'দেখি' তখন আমরা নিজেদেরকে সেই ভূদৃশ্যে প্রতিস্থাপন করি। যদি অতীতের কোনো শিল্পকর্ম 'দেখি', আমরা নিজেদের সেই ইতিহাসের মধ্যে প্রতিস্থাপন করি। যখন সেটি দেখতে আমাদের বাধা দেয়া হয় তখন আমাদের ইতিহাস থেকে বঞ্চিত করা হয়, যে ইতিহাস আমাদের। আর আমাদের বঞ্চিত করবার মাধ্যমে কে আসলে লাভবান হয়? পরিশেষে, অতীতের শিল্পকলাকে রহস্যময় করে তোলার প্রক্রিয়া চলমান থাকে, কারণ সুবিধাবাদী মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ছদ্ম একটি ইতিহাস গড়বার প্রচেষ্টা করে, যা কিনা পশ্চাদ্দৃষ্টিতে শাসকশ্রেণি হিসেবে তাদের ভূমিকা সমর্থনীয় করে তুলতে পারে। কিন্তু এই ধরনের কোনো যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আধুনিক সময়ের ভাষায় আর অর্থবহ কিছু হয়ে উঠতে পারে না। এবং সেই কারণেই, অবশ্যম্ভাবীভাবে এটি রহস্যময়তা সৃষ্টি করে।

আসুন এই ধরনের রহস্যকরণের একটি বৈশিষ্ট্যসূচক উদাহরণ বিবেচনা করা যাক। শিল্পী ফ্রান্স হলসের কর্মময় জীবন নিয়ে দুই খণ্ডের একটি গবেষণা গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে (ফ্রান্স হলস, সেমুর স্লাইভ,ফাইডন,লন্ডন)। এই শিল্পীকে নিয়ে অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়েছে এমন বইগুলোর মধ্যে এটি অবশ্যই নির্ভরযোগ্য একটি প্রামাণ্য দলিল। তবে শিল্পকলার ইতিহাসের বই হিসেবে গড়পড়তা কোনো বইয়ের তুলনায় এটি ভালোও না আবার খারাপও না।

(ফ্রান্স হলস (১৫৮০-১৬৬৬) - রিজেন্টস অব দি ওল্ড মেন'স আল্মস হাউজ)

(ফ্রান্স হলস (১৫৮০-১৬৬৬) - রিজেন্টস অব দি ওল্ড মেন'স আল্মস হাউজ)

ফ্রান্স হলসের জীবনের সর্বশেষ বিখ্যাত দুই চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু ছিল হল্যান্ডের হারলেমে অবস্থিত বৃদ্ধ গরীবদের জন্য নির্মিত একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও প্রশাসকদের প্রতিকৃতি। এগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে কমিশন দিয়ে আঁকানো প্রতিকৃতি। হলস তখন বৃদ্ধ এবং বয়স ছিল আশির উপরে ও তিনি ছিলেন হতদরিদ্র। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চিত্রকর্ম দুটি আঁকিয়ে নেবার জন্য পরিচালক ও প্রশাসকরা হলসকে নির্বাচিত করেছিলেন। তার জীবনের অধিকাংশ সময়েই হলস ছিলেন ঋণগ্রস্থ ও দরিদ্র। ১৬৬৪ সালের শীতে, যে বছর তিনি এই কাজটি শুরু করেছিলেন, সেই বছর এই দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান হিসেবে তিনি তিন বস্তা কয়লা সংগ্রহ করেছিলেন, নতুবা হয়তো সেই তীব্র শীতে ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয়ে তিনি নিশ্চিত মারা যেতেন। এই প্রতিকৃতির জন্য যারা তার মডেল হয়েছিল, তারা সবাই ছিলেন এই ধরনের একটি দাতব্য সংস্থার হর্তাকর্তা।

লেখক বইটিতে এই বাস্তব সত্য লিপিবদ্ধ করেছেন, এবং তারপর সুস্পষ্টভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, এই চিত্রকর্মে যাদের আঁকা হয়েছে, এখানে তাদের কোনো সমালোচনা করা হয়েছে বলে মনে করা সঠিক হবে না। তিনি বলেন, কোনো প্রমাণ নেই যে, হলস তিক্ততার অনুভূতি নিয়ে তাদের এঁকেছিলেন। তবে লেখকের মতে দুটো কাজই হচ্ছে অসাধারণ চিত্রকর্মের উদাহরণ, এবং এর কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রতিকৃতির নারী-রাজপ্রতিনিধিদের নিয়ে তিনি লেখেন:

প্রতিটি নারী সমান পরিমান গুরুত্ব দিয়ে মানবিক এই পরিস্থিতির কথা আমাদের জানাচ্ছে। ক্যানভাসের এই সুবিশাল অন্ধকার বিস্তৃতিতে প্রতিটি নারী সমানভাবে সুস্পষ্ট, তারপরও তারা সংযুক্ত দৃঢ়, ছন্দময় ঈষৎ কৌণিক সজ্জায়, তাদের মাথা এবং হাতের অবস্থানের কারণে যা তৈরি হয়েছে। গভীর আর দ্বীপ্ত কৃষ্ণ পটভূমির সূক্ষ্ম পরিবর্তন পুরো চিত্রকর্মটি চমৎকার একটি সঙ্গতিপূর্ণ সংমিশ্রণে রূপান্তরিত করতে বিশেষ অবদান রেখেছে এবং শক্তিশালী সাদা রং এবং গায়ের চামড়ার জীবন্ত উজ্জ্বল রং একটি অবিস্মরণীয় বিভেদ সৃষ্টি করেছে, যেখানে বিচ্ছিন্ন তুলির আঁচড় এর সর্বোচ্চ ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব ছুঁতে পেরেছে। (আমাদের চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোর নীচে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।)

কোনো একটি চিত্রকর্মের বিন্যাসগত একাত্মতা চিত্রটিকে শক্তিশালী করতে মৌলিক ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো একটি চিত্রকর্মের বিন্যাসকে বিবেচনায় রাখা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এখানে সেই চিত্রকর্মের বিন্যাসকে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেন এটি এককভাবে এই তৈলচিত্রটির আবেগময় শক্তির উৎস। কিছু শব্দগুচ্ছ, যেমন ‘সঙ্গতিপূর্ণ সংমিশ্রণ’, ‘অবিস্মরণীয় বিভেদ’, ‘সর্বোচ্চ ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব ছোঁয়া’, এই চিত্রকর্মের দৃশ্য কর্তৃক প্ররোচিত আবেগকে এর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার স্তর থেকে ‘নির্বিকার শিল্পকলা মূল্যায়ন’- এর আবেগহীন স্তরে প্রতিস্থাপিত করে। সংঘার্ষিক সব উপস্থিতি এখানে অপসারিত হয়। শুধু অবশিষ্ট থাকে অপরিবর্তিত ‘মানব পরিস্থিতি’, আর চিত্রকর্মটি চমৎকারভাবে সৃষ্ট একটি বস্তু হিসেবে বিবেচ্য হয়।

শিল্পী হলস বা যারা তাকে এই কাজটি করবার জন্য কমিশন দিয়েছিলেন, এখানে উপস্থিত সেই রাজপ্রতিনিধিদের সম্বন্ধে খুব সামান্যই আমাদের জানা আছে। তাদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিলো, তা প্রতিষ্ঠা করবার করার জন্য পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় পরোক্ষ কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করাও সম্ভব নয়। কিন্তু চিত্রকর্মগুলো নিজেই এখানে কিছু প্রমাণের যোগান দিতে পারে: একদল পুরুষ ও একদল নারীকে শিল্পী কীভাবে দেখেছিলেন তার প্রমাণ বহন করছে এই চিত্রকর্মগুলো। সেই প্রমাণটি ভালো করে নিরীক্ষা করুন আগে এবং তারপর আপনি নিজে সিদ্ধান্ত নিন।

শিল্পকলার ইতিহাসবিদরা এই ধরনের সরাসরি বিচার বিবেচনাগুলো নিয়ে সাধারণত শঙ্কাবোধ করেন :

> হলসের অন্য বহু চিত্রকর্মে যেমন আমরা দেখেছি, আলোড়িত করবার মতো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যায়ন, প্রায় পুরোপুরিভাবে আমাদের বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করে যে এখানে যে নারী ও পুরুষদের প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছে, তাদের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এমনকি তাদের নানা অভ্যাসগত আচরণ সম্বন্ধেও যেন আমরা জানি।

লেখক এই ‘প্ররোচনা’ বলতে আসলে কী বোঝাতে চাইছেন? আমাদের মননের উপর এই চিত্রকর্মটির প্রভাবের চেয়ে এটি কম কিছু নয়। এই প্রক্রিয়াটি আমাদের মনের উপর কাজ করে কারণ হলস কীভাবে তার এই চিত্রকর্মের মডেল পাত্রপাত্রীদের দেখেছিলেন সেই বিষয়টি আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি। কিন্তু বিনা প্রশ্নে আমরা সেটি গ্রহণ করিনি। আমরা তা গ্রহণ করেছি, যতক্ষণ না পর্যন্ত এই মানুষগুলো, তাদের ভঙ্গিমা এবং মুখমণ্ডল এবং প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের নিজেদের পর্যবেক্ষণের সাথে মিলছে। আর এটা সম্ভব কারণ, আমরা এখনো তুলনাযোগ্য সামাজিক সম্পর্ক ও নৈতিক মূল্যবোধের সমাজে বাস করি। এবং নির্দিষ্টভাবে এটি এই চিত্রকর্মগুলোকে এদের মনোজাগতিক ও সামাজিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এবং এটাই, কোনো চিত্রকরের প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ করবার কোন দক্ষতা নয়, যা আমাদের বিশ্বাস করায়, তৈলচিত্রটিতে যে মানুষগুলোর প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছে আমরা তাদের চিনতে সক্ষম হতে ‘পারি’।

লেখক আরো মন্তব্য করেন:

> কিছু সমালোচকদের ক্ষেত্রে প্ররোচনাময় এই প্রলুব্ধকরণ পুরোপুরি সফল হয়েছে। যেমন, দাবি করা হয়েছে সুচালো অগ্রভাগযুক্ত বাঁকা হয়ে একপাশে হেলে থাকা টুপি পরা রাজপ্রতিনিধি, যার টুপি কোনভাবেই তার দীর্ঘ, মাথার সাথে চেপে লেগে থাকা শীর্ণ চুলগুলোকে আদৌ ঢেকে রাখতে পারেনি এবং তার কৌতুলোদ্দীপকভাবে আঁকা চোখে কোনো মনোযোগ নেই, তাকে আসলে মদ্যপ অবস্থায় দেখানো হয়েছে।

তিনি প্রস্তাব করেন, এটি কুৎসা রটানোর মতো একটি কাজ। তার মতে মাথার একপাশে টুপি পরা সেই সময়ের একটি ফ্যাশন ছিল। তিনি প্রমাণ হিসেবে চিকিৎসকের মতামত

উল্লেখ করে দাবি করেন যে, এই রাজপ্রতিনিধির মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি পক্ষাঘাতের কারণেও হতে পারে। তিনি আরো দাবি করেন যে, চিত্রকর্মটি রাজপ্রতিনিধিদের কাছে মোটেও গ্রহণযোগ্য হতো না, যদি তাদের কাউকে নেশাগ্রস্ত হিসেবে আঁকা হতো। কেউ চাইলে এই প্রতিটি বিষয় নিয়ে পাতার পর পাতা আলোচনা অব্যাহত রাখতে পারেন (যেমন, সপ্তদশ শতাব্দীর হল্যান্ডের পুরুষরা তাদের মাথার একপাশে টুপি পরতেন যেন তাদের দেখে মনে করা হয় তারা বেশ আমুদে এবং অভিযানপ্রিয় দুঃসাহসী, আর অতিরিক্ত মদ্যপানকে সামাজিকভাবে খারাপ চোখে দেখা হতো না.. ইত্যাদি)। কিন্তু এই ধরনের আলোচনা, মূল যে বিষয়টির মুখোমুখি হতে হবে সেখান থেকে আমাদের আরো দূরে নিয়ে যায়, যা এই লেখক এড়িয়ে যাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এই মুখোমুখি হবার উদাহরণটিতে রাজপ্রতিনিধি নারী-পুরুষরা হলসের দিকে তাকিয়ে আছেন, হলস তখন ঋণগ্রস্থ হতদরিদ্র একজন শিল্পী, যিনি তার সামাজিক সম্মান হারিয়েছেন এবং মানুষের দানের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছেন। তিনি চিত্রকর্মটির পাত্রপাত্রীদের নিরীক্ষা করেছেন দরিদ্র একজন মানুষের দৃষ্টি দিয়ে, তাসত্ত্বেও তাকে অবশ্যই তার বিষয়বস্তুর প্রতি বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে, যেমন, অবশ্যই একজন দরিদ্র হিসেবে তাদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা তাকে অতিক্রম করতে হবে। এইসব চিত্রকর্মগুলোয় নাটকীয়তা আসলে এখানেই। ‘অবিস্মরণীয় বিভেদ’ এর নাটকীয়তা।

রহস্যকরণ প্রক্রিয়ার সাথে ব্যবহৃত শব্দাভাণ্ডারের যোগসূত্র নেই বললেই চলে। রহস্যকরণ হচ্ছে অন্যথায় যা সুস্পষ্ট হতো সেটি ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে বাতিল করে দেয়ার

একটি প্রক্রিয়া। হলস সম্ভবত প্রথম প্রতিকৃতিশিল্পী যিনি পুঁজিবাদের উত্থানের মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন চরিত্র আর অভিব্যক্তির ছবি এঁকেছিলেন। বালজাক দুই শতাব্দী পর সাহিত্যে যা করেছিলেন, হলস সেটি তার তৈলচিত্রের ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। তারপরও হলসের আঁকা চিত্রকর্মগুলোর উপর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য গ্রন্থটির লেখক শিল্পীর অর্জন কী সেটি সারসংক্ষেপ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন :

> নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি হলসের দ্বিধাহীন দায়বদ্ধতা, যা আমাদের মানব ভাতৃত্ববোধের চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে আর সেই ক্রমবর্ধনশীল শক্তিশালী তাড়নার প্রতি আমাদের বিস্ময়বোধকে তীব্রতর করেছে, সেটাই তাকে জীবনের মূল প্রাণশক্তিগুলোর অন্তরঙ্গ চিত্র আমাদের কাছে উপস্থাপন করতে সক্ষমতা দিয়েছিল।

এটি হচ্ছে রহস্যকরণ।

অতীতের এই রহস্যকরণ এড়াতে (ছদ্ম-মার্কসবাদী রহস্যময়তা দিয়ে যার আক্রান্ত হবার সমপরিমান সম্ভাবনা আছে) আসুন আমরা এখন পরীক্ষা করে দেখি, বর্তমান আর অতীতের মধ্যে নির্দিষ্ট কী ধরনের সম্পর্ক যার এখনো অস্তিত্ব আছে, বিশেষ করে দৃশ্যমান ছবির ক্ষেত্রে। আমরা যদি বর্তমানকে যথেষ্ট স্পষ্টভাবে দেখতে পারি, তাহলে আমরা অতীত সম্বন্ধে সঠিক প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে পারবো।

আজ আমরা অতীতের শিল্পকলা যেমনভাবে দেখি তেমন করে কেউই দেখেনি কোনোদিন। আসলেই আমরা খুব ভিন্নভাবে তাদের প্রত্যক্ষকরণ ও অনুধাবন করি।

এই পার্থক্যটির উদাহরণ দেয়া যেতে পারে পার্সপেকটিভ বা দর্শনানুপাত বলতে কী বোঝানো হতো সেই ভাষায়। দর্শনানুপাতের রীতি - ইউরোপীয় শিল্পকলায় যা একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য (বিষয়বস্তুর দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, গভীরতা, অবস্থান দূরত্ব অনুযায়ী চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি) এবং রেনেসাঁর শুরুর দিকে যার সূচনা হয়েছিল - সবকিছুকেই দর্শকের চোখের কেন্দ্রীয় অক্ষের চারপাশে বিন্যস্ত করেছিল। যেন সেটি বাতিঘরের আলোকবর্তিকার মতো, তবে বহির্মুখী আলোর ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর দৃশ্যটি অন্তর্মুখী। প্রচলিত প্রথা এই সব দৃষ্টিগ্রাহ্য আবির্ভাবগুলোকে নাম দিয়েছে 'বাস্তবতা'। দর্শনানুপাত চোখকে দৃশ্যমান জগতের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছিল, সবকিছু সেই চোখে এসে একীভূত হয় , যেন অসীমে অদৃশ্য হবার কোনো বিন্দু। দৃশ্যমান জগৎ দর্শকের জন্য বিন্যস্ত হয়, যেমন করে একসময় ভাবা হতো ঈশ্বরের জন্য এই মহাবিশ্ব সজ্জিত হয়েছিল ।

দর্শনানুপাতের রীতি অনুযায়ী এখানে পারস্পরিক দৃষ্টিগোচরতা অনুপস্থিত। অন্যদের সাপেক্ষে ঈশ্বরের সেখানে নিজেকে প্রতিস্থাপিত করবার কোনো প্রয়োজন নেই: কারণ তিনি নিজেই সেই পরিস্থিতি। দর্শনানুপাতের অন্তর্গত স্ববিরোধীতাটি হচ্ছে এটি বাস্তবতার সব চিত্রগুলো এমনভাবে সজ্জিত করে যেন তা কোনো একটি মাত্র দর্শকের প্রতি নির্দেশিত; যে কিনা ঈশ্বরের ব্যতিক্রম, কোনো একটি সময়ে শুধুমাত্র একটি জায়গায় থাকতে পারে।

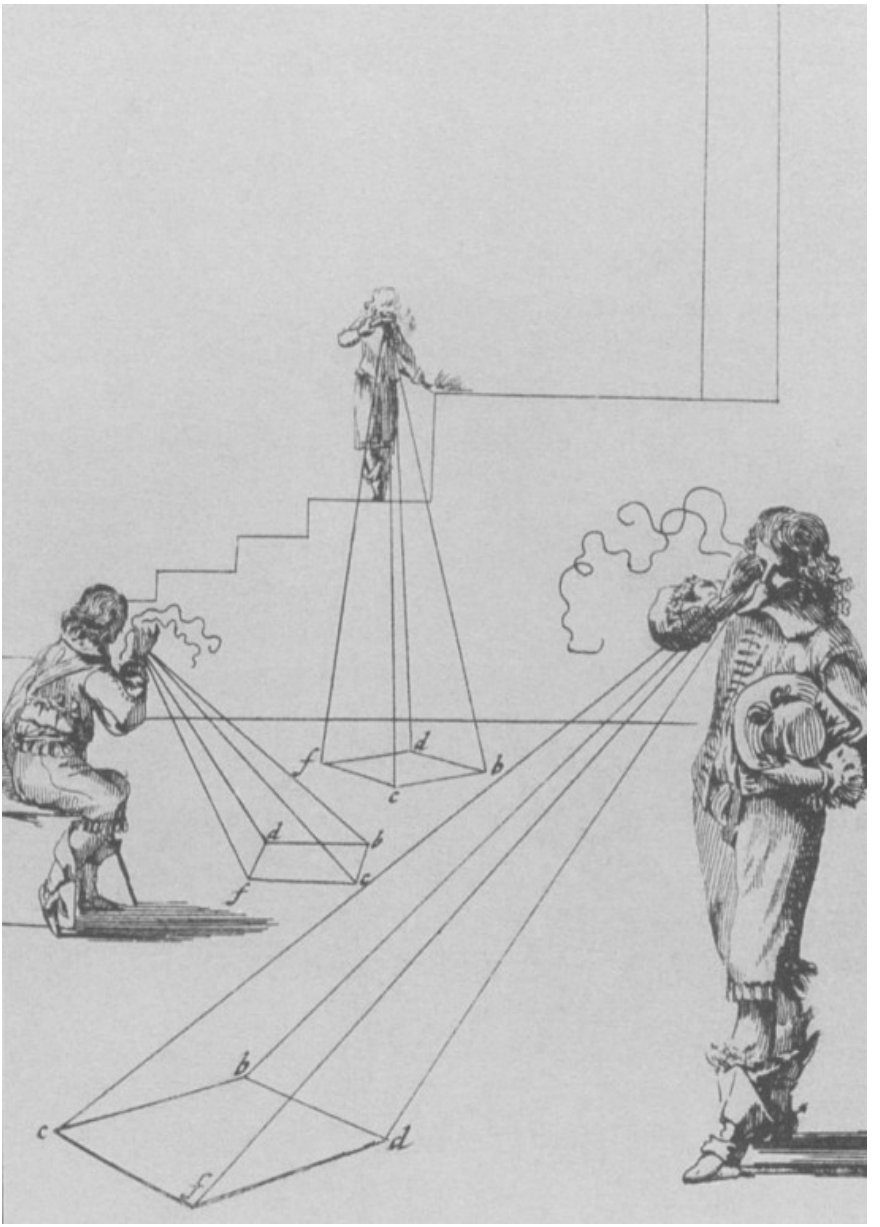

ক্যামেরা আবিষ্কারের পর থেকেই এই স্ববিরোধিতাটি ক্রমশ আরো বেশি সুস্পষ্ট হতে শুরু করেছিল।

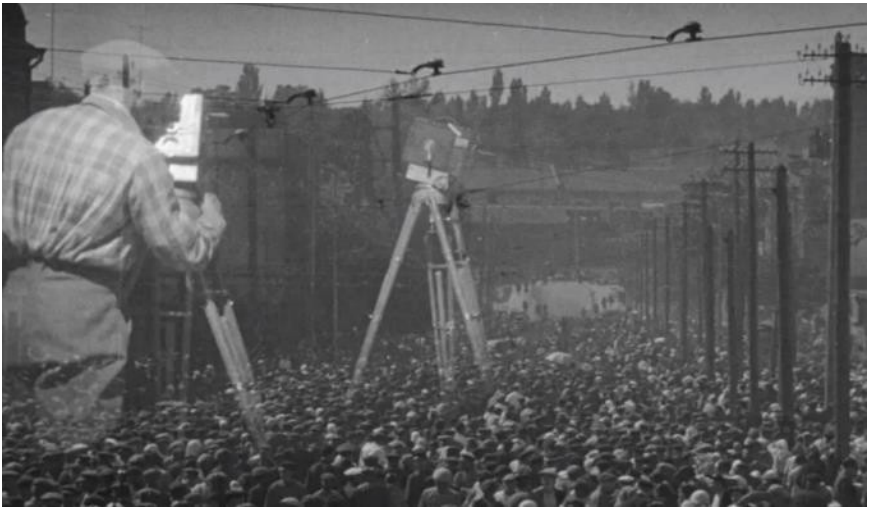

(ভেরটভ পরিচালিত 'ম্যান উইথ এ মুভি ক্যামেরা' থেকে নেয়া একটি স্থিরচিত্র)

> আমি একটি চোখ। একটি যান্ত্রিক চোখ। আমি, সেই যন্ত্রটি, আপনাদের এমনভাবে একটি পৃথিবীকে দেখাই, যেভাবে কেবল আমি একাই দেখতে সক্ষম। আমি আজ ও চিরকালের জন্য মানব স্থবিরতা থেকে নিজেকে স্বাধীন করেছি। আমি নিরন্তরভাবে গতিশীল ও চলমান। আমি কোনো বিষয়বস্তুর খুব নিকটে যাই আবার দূরে সরে আসি । আমি হামাগুড়ি দিয়ে তাদের নীচে প্রবেশ করি। দৌড়ে চলা কোনো ঘোড়ার মুখের পাশে আমি দৌড়াই। আমি পড়ে যাই আবার উঠে দাড়াই, পড়ে যাওয়া আর উঠে দাড়ানো কোনো শরীরের সাথে। এটাই আমি, যন্ত্র, বিশৃঙ্খল গতিময়তার মাঝে আমি আমার কাজ করতে থাকি, একটার পর একটা অবস্থান পরিবর্তন আমি লিপিবদ্ধ করি সবচেয়ে জটিলতম সন্নিবেশন প্রক্রিয়ার সাথে।
>
> স্থান ও কালের বন্ধন থেকে আমি মুক্ত, আমি মহাবিশ্বের যে-কোনো এবং সব বিন্দুর মধ্যে সমন্বয় করতে পারি, যেখানে আমি তাদের রাখতে চাই, সেখানে তাদের স্থাপন করতে পারি। পৃথিবী সম্বন্ধে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে আমার দেখানো এই পথ। এভাবে আমি নতুন একটি উপায়ে পৃথিবীটাকে ব্যাখ্যা করি যা আপনার কাছে অজানা। (এই উদ্ধৃতিটি যুগান্তকারী সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালক ডিজিগা ভেরটভের ১৯৩২ সালে লেখা একটি প্রবন্ধ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।)

ক্যামেরা একটি মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিগোচর কোনো কিছুর আবির্ভাব বা উপস্থিতিকে বিচ্ছিন্ন করে, এবং এটি করার মাধ্যমেই কোনো চিত্র যে কালোত্তীর্ণ সেই ধারণাটিকে এটি তা ধ্বংস করে। অথবা, অন্যভাবে যদি বলা হয়, ক্যামেরা আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, সময় অতিক্রম হবার ধারণাটি কোনো কিছু দেখবার অভিজ্ঞতা থেকে অবিচ্ছেদ্য (শুধু চিত্রকর্ম

এর ব্যতিক্রম)। আপনি কী দেখেছেন তা নির্ভর করবে আপনি কখন আর কোথায় ছিলেন। আপনি যা দেখেছিলেন সেটি স্থান ও কালের সাথে আপনার সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। আগের মতো আর কল্পনা করা সম্ভব হয় না যে, সব কিছু অসীমে মিলিয়ে যাবার সেই বিন্দুর মতো মানুষের চোখের উপর এসে একীভূত হচ্ছে।

এখানে কিন্তু এমন কিছু বলা হচ্ছে না যে, ক্যামেরা আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ বিশ্বাস করতো সবাই সবকিছু দেখতে পারে। কিন্তু দর্শনানুপাত দৃষ্টিসীমাকে এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে যেন সেটি আসলেই আদর্শ। প্রতিটি রেখাচিত্র এবং তৈলচিত্রে, যেখানে দর্শনানুপাত ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানেই এটি এর দর্শককে প্রস্তাব করছে যে, সে এই পৃথিবীরই অনন্য কেন্দ্র। ক্যামেরা - এবং বিশেষ করে 'মুভি' ক্যামেরা - প্রদর্শন করেছে এমন কোনো কেন্দ্রের আসলে অস্তিত্ব নেই।

ক্যামেরা আবিষ্কার হবার কারণে মানুষ কীভাবে দেখে, সেটি অনেকটাই বদলে গেছে। দৃশ্যমান কিছু তাদের কাছে ভিন্ন একটি অর্থ নিয়ে আবির্ভূত হয়, আর চিত্রকলায় আমরা সেই বিষয়টির তাৎক্ষণিক প্রতিফলন দেখি ।

ইমপ্রেশনিস্ট ঘরানার শিল্পীদের ক্ষেত্রে, দৃশ্যমান কিছু মানুষের দৃষ্টিগোচর হতে আর নিজেকে উপস্থাপন করে না । বরং এর বিপরীত, যা কিছু দৃশ্যমান, সেটি যেন নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহে পরিবর্তন পরম্পরায় বিদ্যমান, ধরাছোঁয়ার সীমানার বাইরে, এর দর্শকের কাছে রূপান্তরিত হয়, যেন কোনো ফেরারি। কিউবিস্টদের কাছে দৃশ্যমান কোনো কিছু আর একটি মাত্র চোখ দিয়ে দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং যে বস্তুটিকে (বা ব্যাক্তিটিকে) আঁকা হয়েছে, সেটির চারপাশের সম্ভাব্য সকল দিক থেকে দেখা দৃশ্যগুলোর একটি সামগ্রিকতায় এটি দৃশ্যমান হয় এর দর্শকের কাছে ।

(পিকাসোর (১৮৮১—১৯৭৩) স্টিললাইফ উইথ উইকার চেয়ার)

ক্যামেরা আবিষ্কার হবার বহু আগে আঁকা চিত্রকলাকে যেভাবে মানুষ দেখতো, সেটিরও পরিবর্তন হয়েছে এর আবিষ্কারের পরে। মূলত চিত্রকর্মগুলো ছিল কোনো ভবনের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ, যার জন্যে এগুলো পরিকল্পনা করে আঁকা হয়েছিল। রেনেসাঁ পর্বের শুরুর দিকে কোনো গীর্জা বা চ্যাপেলের দেয়ালে সাজানো ছবিগুলোকে দেখলে মনে হয় তারা সেই ভবনের অভ্যন্তরীণ জীবনকে প্রতিনিধিত্ব করছে। এবং এই দুটি বিষয় একসাথে ভবনটির নিজস্ব স্মৃতিকে গড়ে তোলে, এমনভাবে যেন তারা সুনির্দিষ্টভাবেই সেই ভবনের বৈশিষ্ট্যময়তার অংশ হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

(চার্চ অব সেইন্ট ফ্রান্সিস অ্যাট আসিসি)

প্রতিটি চিত্রকর্মের অনন্যতা হচ্ছে কোনো একসময় এটি যেখানে ছিল, সেই স্থানটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের অংশ ছিল। মাঝে মাঝে কোনো চিত্রকর্ম স্থানান্তরযোগ্য হতে পারে। কিন্তু কখনোই এটিকে একই সাথে একই সময়ে দুটি পৃথক জায়গায় দেখা সম্ভব না। যখন ক্যামেরা কোনো একটি চিত্রকর্মের পুনর্মুদ্রিত চিত্ররূপটি সৃষ্টি করে, এটি চিত্রকর্মটির সেই অনন্য বৈশিষ্ট্যটিকে নষ্ট করে। ফলে এর অর্থও বদলে যায়। কিংবা, আরো সঠিকভাবে, এ র অর্থ বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং বহু বিভক্ত হয়ে বহু অর্থে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এই বিষয়টি আমরা খুব স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হতে দেখি যখন কোনো চিত্রকর্মকে টেলিভিশনের পর্দায় প্রদর্শন করবার পরে যা ঘটে তার মাধ্যমে। চিত্রকর্মটি দর্শকের ঘরে প্রবেশ করে, যেখানে এর চারপাশ পরিবেষ্টিত করে রাখে দর্শকের নিজের দেয়ালে লাগানো ওয়ালপেপার, তার আসবাবপত্র, তার নিজের নানা স্মৃতিচিহ্ন। এটি তার পরিবারের আবহের মধ্যে প্রবেশ করে। চিত্রকর্মটি তাদের আলোচনার একটি বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। তাদের অর্থের সাথে চিত্রকর্মটির নিজস্ব অর্থ যুক্ত হয়। এবং একই সাথে এটি আরো লক্ষ লক্ষ গৃহে প্রবেশ করে, এবং তাদের প্রত্যেকটিতে সেই চিত্রকর্মটিকে দেখা হয় পৃথক পৃথক প্রাসঙ্গিকতায়। ক্যামেরার কারণে, দর্শক চিত্রকর্মটির কাছে যায় না বরং সেই চিত্রকর্মটিই দর্শকের কাছে এসে উপস্থিত হয় —বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে এর অর্থ।

কেউ হয়তো যুক্তি দিতে পারেন, কোনো একটি চিত্রকর্মের সব পুনর্মুদ্রিত চিত্ররূপ কম বেশি এর মূল অর্থকে বিকৃত করে এবং সে কারণেই মূল চিত্রকর্মটি তারপরও এক অর্থে

অনন্য। নীচে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি'র 'দ্য ভার্জিন অব দ্য রকস' চিত্রকর্মটির পুনর্মুদ্রিত চিত্ররূপটি লক্ষ্য করুন।

(লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'দ্য ভার্জিন অব দ্য রকস', ন্যাশনাল গ্যালারি লন্ডন)

এই প্রতিলিপি চিত্ররূপটি দেখার পর, যে কেউই ন্যাশনাল গ্যালারিতে গিয়ে মূল চিত্রকর্মটি দেখে আসতে পারেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করতে পারেন, এই মূল

চিত্রকর্মটির প্রতিলিপি চিত্রটিতে কিসের ঘাটতি আছে। বিকল্পভাবে কেউ হয়তো প্রতিলিপিটির গুণগতমানটি ভুলে যেতে পারেন এবং পরবর্তীতে মূল চিত্রকর্মটি দেখবার সময় তিনি স্মরণ করতে পারেন যে, এটি একটি বিখ্যাত চিত্রকর্ম এবং ইতিপূর্বে কোথাও তিনি এই চিত্রকর্মটির পুনর্মুদ্রিত একটি প্রতিলিপি দেখেছিলেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই মূল চিত্রকর্মটির অনন্য স্বকীয়তাটি এখন 'মূল চিত্রকর্মের পুনর্মুদ্রিত প্রতিলিপি'তে অবস্থান করছে। এটি আর সেরকম থাকে না, যা এর চিত্রটি প্রদর্শন করছে, যা কোনো একসময় কারো মনে এর অনন্য বৈশিষ্ট্যতায় দাগ কেটেছিল। এখন এটি যা বলছে সেখানে এর প্রথম অর্থটিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং এটি এখন কী বলছে তার মধ্যে আমরা সেটি আবিষ্কার করি।

মূল চিত্রকর্মটির নতুন মর্যাদা এর প্রতিলিপি মুদ্রণ করবার নতুন উপায়গুলোর খুব প্রত্যাশিত ও যৌক্তিক একটি উপসংহার। কিন্তু এই মুহূর্তে, রহস্যকরণ প্রক্রিয়াটির আবারো অনুপ্রবেশ ঘটে । মূল চিত্রকর্মটির অর্থ, এটি তার বিশেষ স্বকীয়তায় কী বলছে সেখানে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং এটি আসলে তার অনন্য বৈশিষ্ট্যময়তায় কী, সেই সত্য দ্বারা সেটি প্রতিস্থাপিত হয়। কীভাবে এর অনন্য অস্তিত্বটিকে মূল্যায়ন করা হয়, আর কীভাবে এটিকে আমাদের বর্তমান সংস্কৃতিতে উপস্থাপন করা হয়? এটি একটি দ্রব্য বা বস্তু হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয় যার মূল্য নির্ভর করে এর দুষ্প্রাপ্যতার উপর। আর এই মূল্যটি পরিমাপ ও নিশ্চিত করা হয় বাজারে এটি সর্বোচ্চ কী মূল্য আদায় করতে পারে তার উপর। কিন্তু এটি আর যা-ই হোক, একটি 'শিল্পকর্ম' এবং শিল্পকর্মকে সকল বাণিজ্যের উর্ধে মনে করা হয়, এবং এর বাজার মূল্যকে তাই এর 'আধ্যাত্মিক মূল্য' মনে করা হয়। কিন্তু কোনো একটি দ্রব্যের আধ্যাত্মিক মূল্য এর কোনো বার্তা কিংবা ব্যাখ্যা বা উদাহরণ থেকে ভিন্ন এবং সেটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব শুধু জাদু কিংবা ধর্মের ভাষায়। এবং যেহেতু আধুনিক সমাজে এই দুটোই কোনো সত্যিকারের শক্তি নয়, সেই কারণে কোনো শিল্পকর্ম, চিত্রকর্ম আচ্ছাদিত থাকে সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা-ধর্মীয় একটি আবরণে। শিল্পকর্মগুলোকে এমনভাবে আলোচনা ও উপস্থাপন করা হয় যেন কোনো পবিত্র স্মারকের ভগ্নাবশেষ: যে ভগ্নাবশেষ বা নিদর্শনগুলো প্রথমত ও সর্বাগ্রে তাদের নিজেদেরই টিকে থাকার স্মারক চিহ্ন বহন করছে। যে অতীতে তাদের জন্ম হয়েছে, সেই অতীত নিয়ে গবেষণা করা হয়, এদের অস্তিত্ব যে সম্পূর্ণ সত্য সেই বিষয়টি নিশ্চিৎ করবার জন্য। এদের শিল্পকর্ম হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয় তখনই, যখন এদের জন্ম উৎস সত্যায়িত করা সম্ভব হয়।

'দ্য ভার্জিন অব দ্য রকস' চিত্রকর্মটির সামনে দাড়িয়ে ন্যাশনাল গ্যালারির কোনো দর্শক হয়তো সেই চিত্রকর্মটি সম্বন্ধে তিনি যা কিছু শুনেছেন বা পড়েছেন সেই সব তথ্যাভিজ্ঞ হয়ে এমন কিছু অনুভব করতে উৎসাহিত হতে পারেন: 'আমি এর সামনে দাড়িয়ে আছি, আমি এটি দেখতে পারছি, লিওনার্দোর এই চিত্রকর্মটি পৃথিবীর অন্য যে-কোনো চিত্রকর্ম থেকে ভিন্ন। ন্যাশনাল গ্যালারিতেই শুধু মূল চিত্রকর্মটি আছে, আমি যদি এই এটি অনেকক্ষণ ধরে খুব ভালোভাবে লক্ষ করি, আমি কোনো-না-কোনোভাবে এর

মৌলিকত্বটি অনুভব করতে পারবো। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি'র 'দ্য ভার্জিন অব দ্য রকস' মৌলিক ও আসল চিত্রকর্ম এবং সেই কারণে এটি সুন্দর।'

((লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'দ্য ভার্জিন অব দ্য রকস', ন্যাশনাল গ্যালারি লন্ডন (ছোট), ল্যুভ, প্যারিস (বড়))

এই ধরনের অনুভূতিকে সরল বিবেচনা করে অস্বীকার করা অবশ্যই ভুল হবে। অভিজ্ঞ কোনো শিল্পবোদ্ধার অভিজাত সংস্কৃতির সাথে এটি সহজভাবেই মানানসই, যার জন্যে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারির ক্যাটালগটি লেখা হয়েছে। 'দ্য ভার্জিন অব দ্য রকস' বিষয়ে লেখাটি সেই ক্যাটালগে সবচেয়ে দীর্ঘতম অন্তর্ভুক্তি, খুব ঘন করে ছাপানো এই লেখাটি প্রায় চৌদ্দ পৃষ্ঠাব্যাপী। সেখানে চিত্রকর্মটির মূল ভাবার্থ নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি। মূলত সেখানে বর্ণনা দেয়া হয়েছে চিত্রকর্মটি আঁকার জন্য কে কমিশন দিয়েছিলেন , এর আইনগত জটিলতা সম্বন্ধে কিছু কথা, কে কখন এর মালিক ছিলেন, সম্ভাব্য তারিখ এবং এর বিভিন্ন মালিকদের পারিবারিক ইতিহাস বৃত্তান্ত। সন্দেহ নেই এই সব তথ্যের পেছনে বহু বছরের গবেষণা রয়েছে। আর এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা এটি আসলে লিওনার্দোরই আঁকা একটি মূল চিত্রকর্ম এবং এর বাড়তি আরো একটি কারণ হলো, ল্যুভ মিউজিয়ামে প্রায় হুবহু যে চিত্রকর্মটি আছে,

সেটি ন্যাশনাল গ্যালারির সংগ্রহে থাকা এই চিত্রকর্মটির একটি প্রতিলিপি মাত্র, সেই বিষয়টিও প্রমাণ করা।

ফরাসী শিল্পকলার ইতিহাসবিদরা এর ঠিক বিপরীতটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

লন্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারি তাদের সংগ্রহে থাকা অন্য যে-কোনো চিত্রকর্মের প্রতিলিপির চেয়ে লিওনার্দোর 'দ্য ভার্জিন অ্যান্ড চাইল্ড উইথ সেইন্ট অ্যান অ্যান্ড দ্য সেইন্ট জন দ্য ব্যাপ্টিষ্ট'-এর ড্রইং অনুশীলনটির সবচেয়ে বেশি পরিমানে বিক্রি করেছে। কয়েক বছর আগেও শিল্পবোদ্ধা পণ্ডিত ছাড়া আর কারোর কাছে এই কাজটি পরিচিত ছিল না। এটি বিখ্যাত হবার কারণ যুক্তরাষ্ট্রের একজন ব্যক্তি ছবিটি কিনতে আড়াই মিলিয়ন পাউন্ড দেবার প্রস্তাব করেছিলেন।

এখন একটি কক্ষে একাকী এটিকে রাখা আছে। কক্ষটি ছোটো কোনো গীর্জা বা চ্যাপেলের মতো। বুলেট প্রতিরোধী বিশেষ কাঁচের পেছনে ড্রইংটি সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। একটু নতুন ধরনের চাকচিক্যও এটি অর্জন করেছে, তবে এটি যা প্রদর্শন করছে বা এই ছবিটির যে অর্থ - সেই কারণে নয়, এটি তার চমৎকারিত্ব, মুগ্ধ করবার ক্ষমতা আর রহস্যময়তা অর্জন করেছে এর বাজার মূল্যের কারণে।

এখন মূল শিল্পকর্মগুলোকে পরিবেষ্টিত করে রাখা মিথ্যা-আধ্যাত্মিকতা মিশ্রিত এই ধার্মিকতা মূলত এদের বাজার মূল্যের উপর নির্ভরশীল, সেটাই তার বিকল্প হিসেবে এই চিত্রকর্মটি যা হারিয়েছে সেই অর্থে রূপান্তরিত হয়েছে যখন ক্যামেরা তাদের সহজে

প্রতিলিপিযোগ্য করে তুলেছিল। এর কাজটি এখন কেবল স্মৃতিবেদনার অনুভূতি জাগিয়ে তোলা। একটি অগণতান্ত্রিক, সুবিধাভোগী গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থার এখনো চলমান মূল্যবোধের অন্তিম অন্তঃসারশূন্য দাবির স্মারকচিহ্ন। যদি ছবিটি তার সত্যিকারের অনন্যতা এবং বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলে, তাহলে শিল্পকর্মটি অর্থাৎ সেই দ্রব্যটিকে অবশ্যই রহস্যময়তা আবৃত করবার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবারো অনন্য বৈশিষ্ট্যময় করে অবশ্যই গড়ে তুলতে হয়।

সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সাধারণত শিল্পকলার গ্যালারি পরিদর্শন করে না। নিচের টেবিলটি দেখাচ্ছে সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষা লাভ করবার সাথে শিল্পকর্মের প্রতি আগ্রহী হওয়ার বিষয়টি কত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ।

টেবিল ১: শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে মূল জনসংখ্যায় চারটি দেশে শিল্পকলা-মিউজিয়াম পরিদর্শনকারী দর্শকদের শতাংশ পরিমান:

	গ্রিস	পোল্যান্ড	ফ্রান্স	হল্যান্ড
কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই	০.০২	০.১২	০.১৫	-
শুধু প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা	০.৩০	১.৫০	০.৪৮	০.৫০
শুধু মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা	১০.৫	১০.৪	১০	২০
আরো উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা	১১.৫	১১.৭	১২.৫	১৭.৩

সূত্র: পিয়ের বুরডিউ এবং অ্যালাঁ ডারবেল, লা'মুর দো লা'র্ট, এডিশিয়ঁ দ্য মি'ন্যুই. পারি ১৯৬৯, সংযোজনী ৫, টেবিল ৪

অধিকাংশই স্বতঃসিদ্ধভাবে গ্রহন করে নেন যে, শিল্পকলার সংগ্রহশালাগুলো মূলত নানা পবিত্র স্মারক-চিহ্নের সম্ভার, যেগুলোর রহস্যময়তা তাদের কাছে দুর্বোধ্য এবং তারা নিজেদের বঞ্চিত বোধ করে: অপরিসীম সম্পদের রহস্য। অথবা অন্যভাবে যদি বলি, তারা বিশ্বাস করেন এই সব মহান শিল্পকর্মগুলো ধনী (অর্থ বিত্তে এবং আধ্যাত্মিকতায়) ব্যক্তিদের সুরক্ষায় নির্মিত সম্পদ। নীচে আরো একটি টেবিল প্রদর্শন করছে একটি শিল্পকলার মিউজিয়াম বলতে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির মানুষরা সাধারণত কী মনে করে থাকেন।

একটি মিউজিয়াম দেখলে নীচের তালিকায় উল্লেখিত জায়গাগুলোর কোনটির কথা আপনার বেশি মনে পড়ে ?			
	কায়িক শ্রমিক	দক্ষ এবং অফিসকর্মী	পেশাজীবী এবং উচ্চ-ব্যবস্থাপনা
	%	%	%
চার্চ	৬৬	৪৫	৩০.৫
লাইব্রেরি	৯	৩৪	২৮
লেকচার হল	-	৪	৪.৫
দোকান কিংবা গণভবনের প্রবেশ পথ	-	৭	২
চার্চ এবং লাইব্রেরি	৯	২	৪.৫
চার্চ এবং লেকচার হল	৪	২	-
লাইব্রেরি এবং লেকচার হল	-	-	২
এর কোনোটাই নয়	৪	২	১৯.৫
কোনো উত্তর নেই	৮	৪	৯
	১০০ (৫৩ জন)	১০০ (৯৮ জন)	১০০ (৯৯ জন)

সূত্র: পিয়ের বুরডিউ এবং অ্যালাঁ ডারবেল, লা'মুর দো লা'র্ট, এডিশিয়ঁ দ্য মি'ন্যুই. পারি ১৯৬৯, সংযোজনী ৪, টেবিল ৮

ছবি প্রতিলিপি করবার যুগে কোনো চিত্রকর্মের অর্থ আর এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাদের অর্থ প্রেরণযোগ্য হয়ে ওঠে: এর অর্থ হচ্ছে এটি এক ধরনের তথ্যে রূপান্তরিত হয়, এবং সব তথ্যের মতোই হয় এটি ব্যবহার নয়তো উপেক্ষা করা হয়। তথ্যটি এর নিজের মধ্যে বিশেষ কোনো কর্তৃত্ব বহন করে না। যখন কোনো চিত্রকর্ম এভাবে ব্যবহার করা হয়, এর অর্থ হয় পরিবর্তিত হয়, নয়তো পুরোপুরি বদলে যায়। কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে আসলে এমন মন্তব্যের মূল অর্থ কী? এটি মূল চিত্রকর্মটির প্রতিলিপিকৃত চিত্ররূপটির কিছু বিষয় বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে প্রতিলিপি করতে ব্যর্থ হয়েছে, এখানে সেই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোনো প্রতিলিপি যা সম্ভব করে, আসলে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে যে, একটি পুনর্মুদ্রিত ছবি বিবিধ কারণে ব্যবহৃত হবে, যা মূল চিত্রকর্মটির ব্যতিক্রম, সব ক্ষেত্রে এটি তার একটি অর্থ সম্প্রদান করবে - সেই প্রশ্নটি এখানে প্রাসঙ্গিকতায় প্রাধান্য পায়। আসুন আমরা এবার পরীক্ষা করে দেখি প্রতিলিপিকৃত কোনো চিত্র কীভাবে নিজেকে এই ধরনের বহু ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে।

(বতিচেল্লির (১৪৪৫—১৫১০) ভিনাস অ্যান্ড মার্স)

প্রতিলিপি সম্পূর্ণ চিত্রকর্ম থেকে একটি অংশ বা ডিটেইল বিচ্ছিন্ন করে। বিচ্ছিন্ন অংশটি রূপান্তরিত হয়। রূপকধর্মী একটি চরিত্র একটি মেয়ের প্রতিকৃতিতে রূপান্তরিত হয়।

যখন কোনো চলচ্চিত্র ক্যামেরার মাধ্যমে একটি চিত্রকর্মের প্রতিলিপি সৃষ্টি করা হয়, এটি অবশ্যম্ভাবীভাবে চলচ্চিত্র নির্মাতার নিজস্ব বক্তব্যের উপাদানেও পরিণত হয়।

চিত্রকর্মের প্রতিলিপি সৃষ্টি করা চলচ্চিত্র সেই চিত্রকর্মের ছবির মাধ্যমেই নির্মাতার নিজস্ব উপসংহারের দিকে দর্শকদের পরিচালিত করে। সেই চিত্রকর্মটি চলচ্চিত্রনির্মাতাকে কর্তৃত্ব প্রদান করে।

এর কারণ সময়ের সাথে চলচ্চিত্র ক্রমান্বয়ে উন্মোচিত হয়, কিন্তু চিত্রকর্মে তা হয় না।

চলচ্চিত্রে যেভাবে একটি চিত্র আরেক চিত্রকে অনুসরণ করে, সেগুলোর ধারাবাহিকতা ছবির বক্তব্যটিকে গঠন করে যা অপরিবর্তনীয় একটি রূপ নেয়।

একটি চিত্রকর্মে এর সব উপাদনগুলো একই সাথে দেখার জন্য একত্রে সেখানেই অবস্থান করে। এর প্রতিটি উপাদান পৃথক পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়তো কোনো দর্শকের সময়ের প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু যখনই সে কোনো একটি উপসংহারে পৌঁছায়, পুরো চিত্রকর্মটি সেখানে একসঙ্গে উপস্থিত থাকে, যা দর্শকের উপসংহারকে পুরো বদলে দিতে অথবা সমর্থন করতে পারে। চিত্রকর্ম এভাবে তার নিজস্ব কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখে।

(ব্রয়গেলের (১৫২৫-১৫৬৯) 'দ্য প্রসেশন টু ক্যালভেরি')

শব্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত করবার মাধ্যমে চিত্রকর্মগুলোর প্রায়শই প্রতিলিপিকরণ হয়ে থাকে।

এই শিল্পকর্মটি গম ক্ষেতের একটি ভূদৃশ্যচিত্র, এক ঝাক পাখি যে দৃশ্য থেকে উড়ে চলে যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য ছবিটি ভালো করে লক্ষ করুন, এবার পাতাটি উল্টান।

(ভিনসেন্ট ভ্যান গো'র 'হুইটফিল্ড অ্যান্ড ক্রোস')

আত্মহত্যা করার আগে এটি শিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গো'র আঁকা শেষ চিত্রকর্ম।

ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন, কীভাবে এই বাক্যটি সম্পূর্ণ চিত্রকর্মটির ভাষাকে বদলে দিয়েছে , তবে কোনো সন্দেহ নেই, বাক্যটি সেটি করেছে। চিত্রকর্মটি এখন ব্যাখ্যা করছে বাক্যটিকে।

এই রচনায় ব্যবহৃত প্রতিটি প্রতিলিপিকৃত চিত্র একটি যুক্তির অংশে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং সেটি চিত্রকর্মটির মূল স্বতন্ত্র অর্থের সাথে সামান্য বা কোনো মিল নাও থাকতে পারে। নিজস্ব বাচনিক কর্তৃত্ব নিশ্চিৎ করতে শব্দ চিত্রকর্মকে উদ্ধৃত করেছে (এই বইটিতে শব্দহীন প্রবন্ধগুলো হয়তো এই পার্থক্যটিকে আরো স্পষ্ট করবে।)

and the Labour Party

STEPHEN JOHNS

MASS UNEMPLOYMENT is the reality facing the Clyde. This will mean poverty and degradation for thousands of workers and their families.

Going at £1,680,000 'It will fit perfectly over my fireplace...'

British tea planters shot by Khan's troops

Bridge contract

drop

Subject and significance in Titian's Death of Actaeon

পরিনামসরূপ একটি প্রতিলিপি, মূল চিত্রকর্মটির সাথে এর নিজের তথ্যসংযোগ করা ছাড়াও এটি নিজেও অন্য ছবিগুলোর জন্যও একটি তথ্যসূত্রে রূপান্তরিত হয়। ছবির সা আশেপাশে কী দেখা যাচ্ছে অথবা এর ঠিক পরপরই কী ঘটনা ঘটেছিল সেই তথ্যগুলোর উপর ভিত্তি করে ছবির অর্থ বদলে যায়। যে ধরনের কর্তৃত্ব এটি ধারণ করে, সেটি যে প্রাসঙ্গিকতা সেই ছবিটি দৃষ্টিগোচর হয়, সেই পুরো প্রাসঙ্গিকতায় বন্টিত হয়।

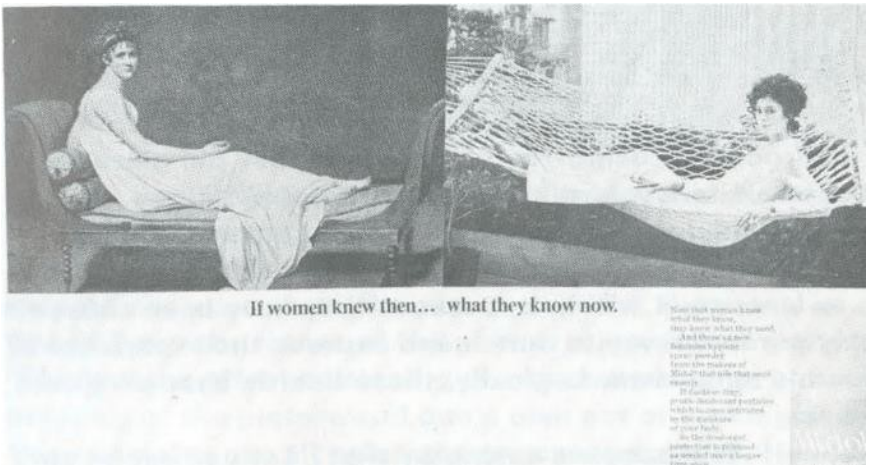

যেহেতু শিল্পকর্ম পুনমুর্দ্রণের মাধ্যমে বহু প্রতিলিপি করা সম্ভব, তাত্ত্বিকভাবে, সেগুলো যে কেউই ব্যবহার করতে পারেন। তারপরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে -শিল্পকলার কোনো বই, পত্রিকা, চলচ্চিত্র বা বসবার ঘরের দেয়ালে সাজানো কোনো আকর্ষণীয় ফ্রেমে - প্রতিলিপিগুলো এখনো সেই বিভ্রমকে শক্তিশালী করতে ব্যবহৃত হয় - আসলে কিছুই বদলায়নি, শিল্পকলা এর অনন্য পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়ে বাকি প্রায় সব প্রকারের কর্তৃত্ব যুক্তিযুক্ত করে - শিল্পকলা অসমতাকে আপাতদৃষ্টিতে মহৎ আর সামাজিক প্রাধান্য কাঠামোর স্তরবিন্যাসকে রোমাঞ্চকর একটি বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করে। যেমন জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর সম্পূর্ণ ধারণাটি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও তার অগ্রাধিকারগুলোর গুণকীর্তন করতে শিল্পকর্মের সেই কর্তৃত্বটিকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে।

প্রতিলিপনের উপায়গুলো এদের অস্তিত্ব যা কিছু সম্ভব করে তোলে তা সব অস্বীকার বা আড়াল করবার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কখনো কখনো কোনো একক ব্যক্তি ভিন্নভাবে তা ব্যবহার করতে পারেন ।

কখনো প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের শোবার বা বসবার ঘরের দেয়ালে বোর্ড দেখা যায়, যেখানে তারা পিন দিয়ে নানা ধরনের কাগজের টুকরো সেটে রাখেন: চিঠি, আলোকচিত্র, কোনো চিত্রকর্মের প্রতিলিপি, খবরের কাগজ থেকে কোনো খবরের কাটা অংশ, মূল ড্রইং , পোষ্টকার্ড ইত্যাদি। কোনো একটি বোর্ডে লাগানো সব ছবিগুলো একই ভাষার প্রতিনিধিত্ব করে, সবগুলোই কমবেশি এক সেখানে, কারণ তাদের বাছাই করা হয়েছে খুবই ব্যক্তিগত পছন্দ কিংবা অপছন্দের ভিত্তিতে, পারস্পরিক সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে, যেগুলোর প্রত্যেকটি সেই কক্ষটির বাসিন্দার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করছে। যৌক্তিকভাবে, এই বোর্ডগুলোর সব মিউজিয়ামগুলোকে প্রতিস্থাপন করা উচিৎ।
আসলে এই দাবি করে আমরা কী বলতে চাইছি? তবে প্রথমে আমাদের নিজেদের নিশ্চিৎ হতে হবে আমরা কী বলছি না।

আমরা বলছি না যে, মূল চিত্রকর্মের সামনে দাড়িয়ে সেগুলো যে এখনো অক্ষতভাবে টিকে আছে সেই বিস্ময়ে হতবাক হওয়া ছাড়া আর কোনো অভিজ্ঞতা হবে না কোনো দর্শকের মনে। যেভাবে সাধারণত কোনো মূল চিত্রকর্মের সাথে আমা পরিচিত হই - মিউজিয়ামের ক্যাটালগ, গাইড বই কিংবা ভাড়া করা ক্যাসেট ইত্যাদি, কোনো চিত্রকর্মের সাথে পরিচিত হবার জন্য এগুলোই একমাত্র উপায় নয়। যখন অতীতের কোনো শিল্পকর্মকে কোনো স্মৃতিবেদনা ছাড়াই দেখতে শুরু করা হয়, সেই শিল্পকর্মটি আর অতীতের পবিত্র কোনো স্মারক থাকে না, যদিও সেগুলো কখনোই আর পুনমুর্দ্রণের মাধ্যমে প্রতিলিপি হবার এই যুগের আগে যেমন ছিল সেই অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে পারে না। আমরা বলছি না যে, সত্যিকারের মূল শিল্পকর্মগুলো এখন অর্থহীন হয়ে গেছে।

(ভারমিয়েরের (১৬৩২ -১৬৭৫) 'উওমেন পোরিং মিল্ক')

মূল চিত্রকর্মগুলো নীরব এবং স্থির সেই অর্থে, যে অর্থে তথ্য কখনো সেই রকম হতে পারে না। এমনকি দেয়ালে ঝোলানো কোনো প্রতিলিপিও এই ক্ষেত্রে তুলনাযোগ্য নয়, কারণ মূল চিত্রকর্মটির সত্যিকারের উপাদান, এর রঙের সাথে মিশে আছে যে নীরবতা ও স্থিরতা , যেখানে কেউ চাইলে শিল্পীর সেই নিজস্ব অভিব্যক্তিগুলো অনুসরণ করতে পারেন, এবং দূরত্ব কমিয়ে সেই সময়ক্ষণ দুটোকে পরস্পরের নিকটে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এটির একটি প্রভাব আছে - যে সময় এটি আঁকা হয়েছে এবং যে সময়ে কেউ নিজে সেটির দিকে তাকাচ্ছেন। এই বিশেষ অর্থে সব চিত্রকর্মই সমসাময়িক। সেই কারণে এদের সাক্ষ্যে এতো তাৎক্ষণিকতা। এদের ঐতিহাসিক মুহূর্ত আক্ষরিকার্থে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত। একজন চিত্রকরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিল্পী সেজান ঠিক একই ধরনের পর্যবেক্ষণ করেছিলেন: 'এই পার্থিব জীবনের একটি মিনিট অতিক্রান্ত হয়! পূর্ণ বাস্তবতায় সেই

মুহূর্তটিকে আঁকা এবং এর জন্য সব কিছু ভুলে যাওয়া! সেই মিনিটে রূপান্তরিত হওয়া, সেই সংবেদনশীল পৃষ্ঠে রূপান্তরিত হওয়া, যা সেই মুহূর্তে আমরা যা দেখছি তার ছবি আমাদের সামনে উপস্থাপন করবে এবং আমাদের সময়ের আগে যা ঘটেছিল তা সব বিস্মরিত হবে....' যখন শিল্পীর আঁকা মুহূর্তটি আমরা চোখের সামনে দেখি, আমরা সেটির কী অর্থ করি সেটি শিল্পকলার কাছে আমাদের প্রত্যাশার উপর নির্ভরশীল, এবং সেটি পক্ষান্তরে নির্ভর করে আজ আমরা কীভাবে ইতিমধ্যেই পুনর্মুদ্রিত হওয়া প্রতিলিপির মাধ্যমে এর অর্থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালব্ধ হয়েছি।

আমরা এও বলছি না যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সব শিল্পকলা বোধগম্য হতে পারে। আমরা দাবি করছি, ম্যাগাজিনের পাতা থেকে প্রাচীন গ্রিক আবক্ষ ভাস্কর্য পুনর্মুদ্রিত কোনো চিত্র কেটে পৃথক করা, কারণ সেটি কোনো বিশেষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেয়, এবং এটি কোনো বোর্ডে বিচিত্র ধরনের ছবির পাশে পিন দিয়ে লাগিয়ে রাখার মানে, সেই ছবিটির পূর্ণ অর্থটি বোধগম্য হবার কাছাকাছি কোনো অবস্থায় কেউ পৌঁছাতে পেরেছেন।

নিষ্কুলষতার ধারণাটি দুটি ভিন্ন উপায়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার সুযোগ করে দেয়। সেই ষড়যন্ত্রে যুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে কেউ সেই ষড়যন্ত্রটি সাপেক্ষে নিষ্পাপ থাকতে পারেন। কিন্তু এই নিষ্পাপ থাকার মানে আবার অজ্ঞ থাকাও। কিন্তু বিষয়টি নিষ্পাপতা বা জ্ঞানের মধ্যে নয় (বা প্রাকৃতিক আর সাংস্কৃতিক জ্ঞানের মধ্যেও নয়) বরং এটি শিল্পকলার প্রতি একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা এটিকে সব ধরনের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত করে এবং শুধু নিজেদের জন্য সংরক্ষিত দুর্বোধ্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে, যা কিছু বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ, যারা ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু শাসক শ্রেণির স্মৃতিকাতর সংরক্ষণকারী কেরানী (ক্ষয়িষ্ণু তবে প্রলেতারিয়েতদের সামনে নয়, বরং কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রের নতুন ক্ষমতার কাছে); সেই কারণে সত্যিকারের প্রশ্নটি হচ্ছে: অতীতের শিল্পকর্মের অর্থ সঠিকভাবে আসলে কাদের প্রতি নির্দেশিত? তাদের জন্য কী, যারা সক্ষম হয় সেটিকে নিজের জীবনে আরোপিত করতে, অথবা নাকি নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রাধান্য কাঠামোর স্তরবিন্যাসসহ প্রাচীন স্মারক বিশেষজ্ঞদের জন্য?

দৃশ্যকলা সবসময়ই এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে একটি নির্দিষ্ট সংরক্ষণের সীমানায়। শুরুতে এই সুরক্ষা বলয় ছিলঐন্দ্রজালিক বা পবিত্রতার। কিন্তু এছাড়াও এর স্পর্শযোগ্য বাস্তব ভৌতিক একটি অস্তিত্ব আছে। এটি একটি জায়গা, একটি গুহা, একটি ভবন, যেখানে এবং যার জন্য শিল্পকর্মটি সৃষ্টি করা হয়েছে। শিল্পকর্ম সৃষ্টির অভিজ্ঞতা - যেটি প্রথমত একটি আচার পালনের অভিজ্ঞতার মতো অবশিষ্ট জীবন থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছে - যার সুনির্দিষ্ট কারণ হচ্ছে, যেন এর উপর কর্তৃত্ব আরোপ করা যায়। পরবর্তীতে শিল্পকলার সংরক্ষণ সামাজিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। এটি শাসক শ্রেণির সংস্কৃতিতে প্রবেশ করে, যখন তাদের আলাদা করে রাখা হয়, বিচ্ছিন্নভাবে, তাদের প্রাসাদ কিংবা ভবনে। এই পুরো ইতিহাস জুড়ে শিল্পকলার কর্তৃত্ব থেকে এর কোনো নির্দিষ্ট সুরক্ষাকারীর কতৃর্ত্ব কখনোই বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

আধুনিক পুনমুর্দ্রণ আর প্রতিলিপি করবার কৌশলগুলো যা করেছে তা হলো, তারা শিল্পকলার কর্তৃত্বকে ধ্বংস করেছে, এটিকে বিচ্ছিন্ন বা অপসারণ করেছে, অথবা বলা যেতে পারে, প্রতিলিপনের মাধ্যমে সুরক্ষিত একটি বলয় থেকে এটি সেই চিত্রকে সরিয়ে এনেছে। প্রথমবারের মতো, শিল্পকলার কোনো ছবি বা চিত্ররূপ ক্ষণস্থায়ী, সর্বব্যাপী, অন্তঃসারশূন্য, সহজলভ্য, মূল্যহীন, বিনামূল্যে পাওয়া যায় এমন কোনো দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়েছে, আমাদের চারিদিক থেকে যা পরিবেষ্টিত করে রাখে, যেমন করে ভাষা আমাদের পরিবেষ্টিত করে রাখে। তারা জীবনের মূলস্রোতে প্রবেশ করেছে ঠিকই, তবে এর উপর কোনো কর্তৃত্ব এদের নিজেদের মধ্যে আর নেই।

যদিও খুব অল্প মানুষ আসলে জানেন, আসলেই কী ঘটেছিলো, কারণ পুনমুর্দ্রণের নানা উপায় প্রায় সবসময়ই সেই বিভ্রমটি প্রচার করতে ব্যবহৃত হয়েছে, যা দাবি করছে - আসলে কিছুই বদলায়নি, শুধু সাধারণ জনগণ প্রতিলিপির কল্যাণে, শিল্পকলার রস আস্বাদন করতে শুরু করেছে, যা একসময় শুধু সাংস্কৃতিবান সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। বোধগম্য কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এখনো নিরুৎসাহিত এবং সন্দিহান।

যদি চিত্রের নতুন ভাষা ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতো, তাহলে এটি, এর ব্যবহারের মাধ্যমে, নতুন একটি ক্ষমতা আরোপ করতে সক্ষম হতো। যার মধ্যে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে আরো সুনির্দিষ্টভাবেই সংজ্ঞায়িত করবার কাজটি শুরু করতে পারতাম, বিশেষ করে সেই ক্ষেত্রগুলোয় যেখানে সেই কাজটি করতে ভাষা বা শব্দ অপ্রতুল। (দেখা আসে শব্দ ব্যবহারের আগে)। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই শুধু নয়, বরং অতীতের সাথে আমাদের সম্পর্কগুলোর প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাগুলোও অর্থাৎ আমাদের জীবনকে অর্থবহ করবার প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা, সেই ইতিহাস বোঝার চেষ্টা করবার অভিজ্ঞতা, যে ইতিহাসের সক্রিয় অংশ হতে পারি আমরা।

অতীতের শিল্পকলা কোনো একসময় যেমন ছিল, সেভাবে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই আর। তাদের সেই কর্তৃত্ব হারিয়ে গেছে। আর এর ফেলে যাওয়া সেই শূন্যস্থানটি পূরণ করেছে চিত্রের ভাষা। এখন যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হচ্ছে, কে এই ভাষাটি ব্যবহার করছে এবং কী উদ্দেশ্যে সেটি ব্যবহার করছে। আর বিষয়টি প্রভাবিত করছে নানা ক্ষেত্র যেমন, পুনমুর্দ্রণের মাধ্যমে প্রতিলিপি সৃষ্টি করবার ক্ষেত্রে স্বত্ত্বাধিকার, শিল্পকলার ছাপাখানা এবং প্রকাশকদের মালিকানা, জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত শিল্পকলার গ্যালারি ও মিউজিয়ামের সার্বিক নীতিমালা ইত্যাদি। যেভাবে সাধারণত বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়ে থাকে যেন এগুলো খুবই সীমিত আকারে শুধু পেশাজীবীদেরই ভাববার বিষয়। এই প্রবন্ধের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল প্রদর্শন করা যে, আসলে বাস্তবিকভাবে যে বিষয়টি এর প্রভাবের বলয়ের অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়টি অনেক ব্যপকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একটি মানুষ বা কোনো একটি শ্রেণি, যাদেরকে তাদের অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, তারা আসলেই, মানুষ বা শ্রেণি হিসেবে কোনো কিছু বেছে নিতে অথবা করতে অপেক্ষাকৃতভাবে সেই মানুষ বা শ্রেণির তুলনায় নিজেদের অনেক কম স্বাধীন অনুভব করতে পারে, যারা ইতিমধ্যেই ইতিহাসে তাদের নিজেদের প্রতিস্থাপন

করতে সক্ষম হয়েছে। আর এই কারণে, এবং এটি হচ্ছে একমাত্র কারণ কেন, অতীতের সমস্ত শিল্পকর্ম একটি রাজনৈতিক বিষয়ে এখন রূপান্তরিত হয়েছে।

এই প্রবন্ধটিতে উল্লেখিত বেশ কিছু ধারণার উৎস অন্য আরেকটি প্রবন্ধ, যা চল্লিশ বছর আগে লিখেছিলেন জার্মান সমালোচক ও দার্শনিক ভাল্টান বেনিয়ামিন ।

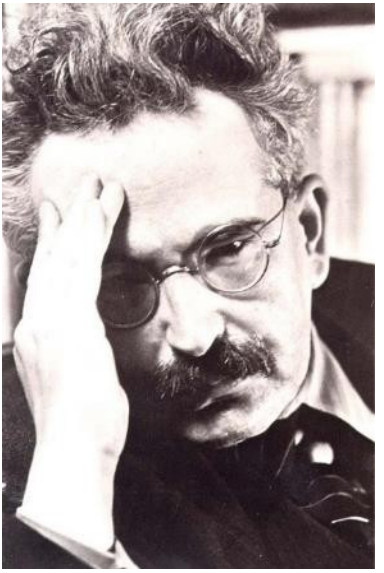

তার সেই প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল, ‘দি ওয়ার্ক অব আর্ট ইন দি এজ অব মেকানিকাল রিপ্রোডাকশন’। প্রবন্ধটির ইংরেজি ভাষান্তর ‘ইল্যুমিনেশনস’ নামক একটি প্রবন্ধ সংকলনে পাওয়া যাবে (কেপ, লন্ডন, ১৯৭০)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

MATCH
PHOTO DE LA SEMAINE
LA ROBE A TENU BON LE SOURIRE

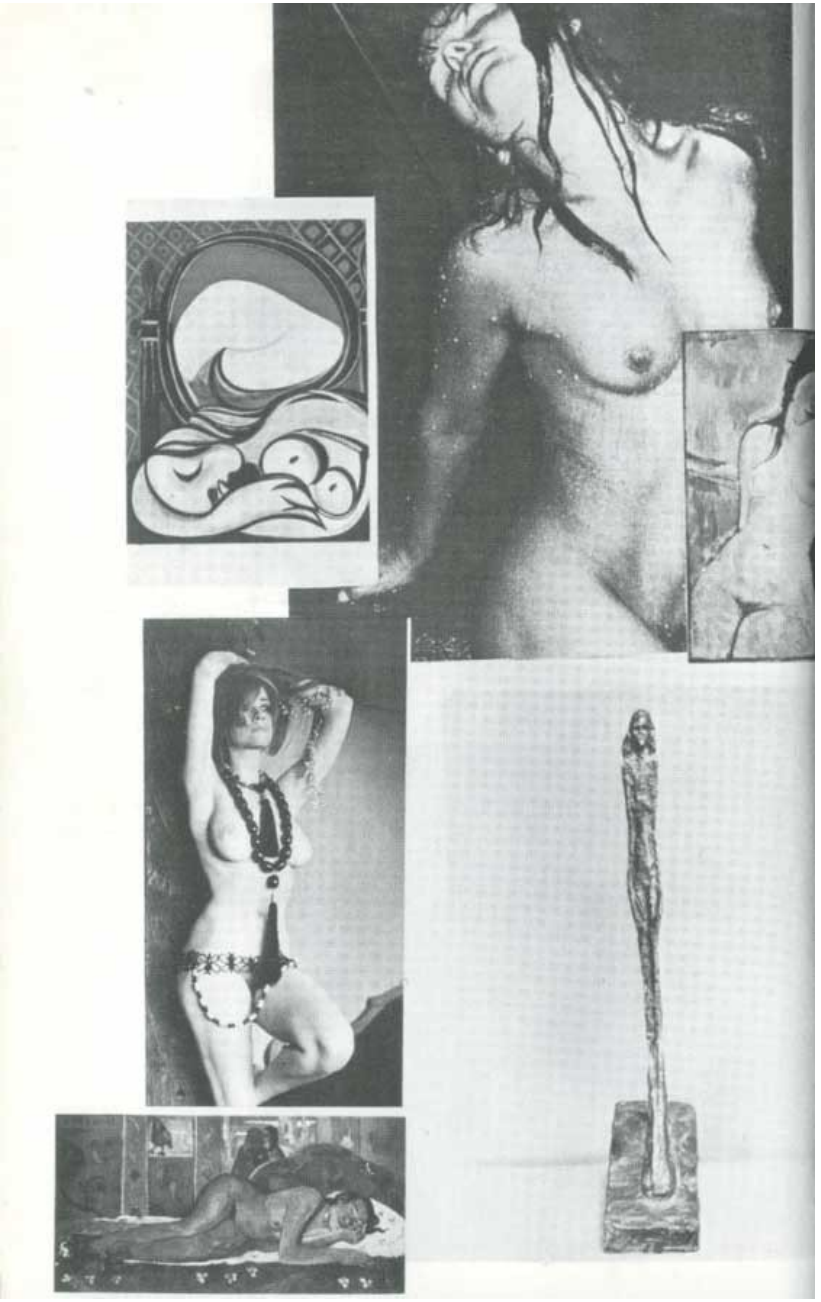

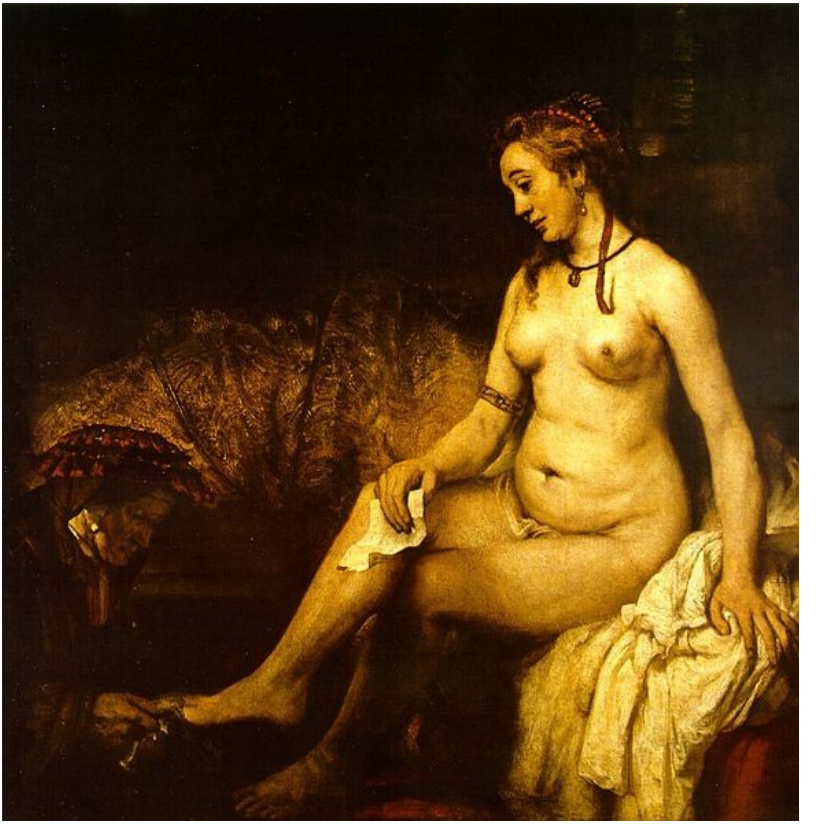

New Ladder-Stops
give up to
25% more wear
even in your sheerest
seamfree stockings
Almay's new lipsticks are a blaze of frosted colour.
But that's only half the story.
ALMAY

Take a sensitive English skin,
cover it with Cooltan,
lay under the sun,
and turn slowly until golden brown.
Cooltan for the English skin.
Frank Cooper puts
everything he's got into
making soup.

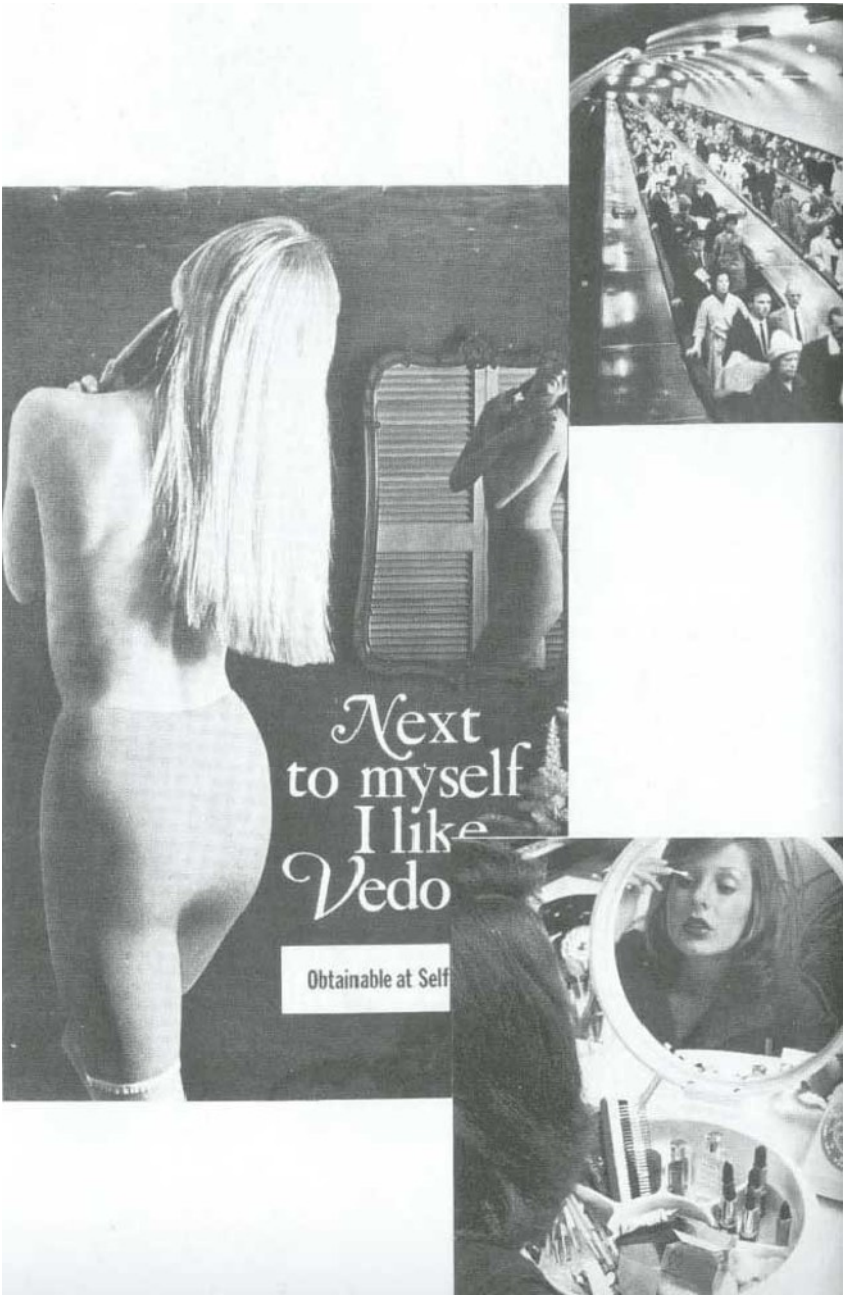
Next
to myself
I like
Vedo
Obtainable at Self

তৃতীয় অধ্যায়

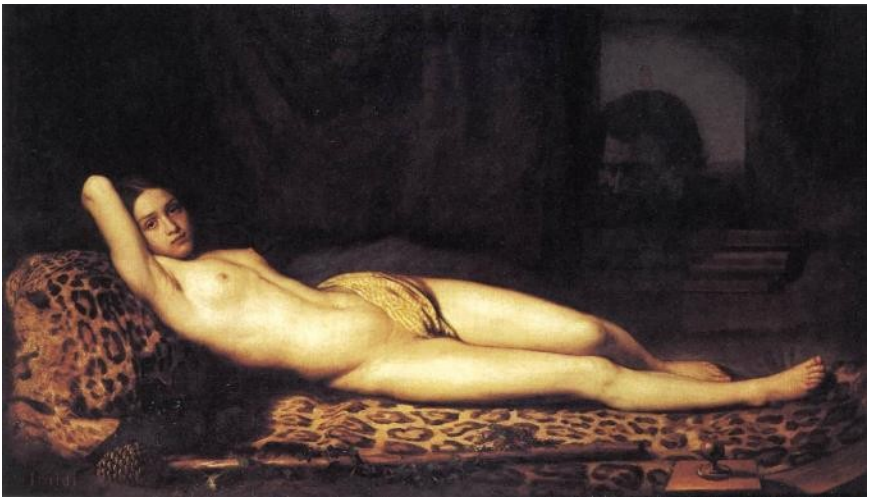

(ফেলিক্স ট্রুটাট (১৮২৪-১৮৪৮), 'রিক্লাইনিং বাক্কান্তে')

প্রচলিত রীতি আর ব্যবহার অনুযায়ী, অবশেষে যদিও সেটি এখন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে , কিন্তু বিষয়টি মীমাংসা হয়েছে সেটি কোনোভাবেই বলা যাবে না, সমাজে একজন নারীর অবস্থান একজন পুরুষের অবস্থান থেকে প্রকৃতিগতভাবেই ভিন্ন। একজন পুরুষের সামাজিক অবস্থান নির্ভর করে, যে ক্ষমতার প্রতিশ্রুতির তিনি প্রতিভূ তার উপর। যদি সেই প্রতিশ্রুতি অনেক বিশাল আর বিশ্বাসযোগ্য হয়, তার উপস্থিতি হবে আকর্ষণীয়। আর যদি সেই প্রতিশ্রুতি হয় ক্ষুদ্র এবং বিশ্বাসযোগ্যতা যদি না থাকে, দেখা যায় তার উপস্থিতিও হয় বেশ অনাড়ম্বর। যে প্রতিশ্রুত শক্তির কথা বলা হচ্ছে, তা নৈতিক, শারীরিক, আচরণগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, যৌন হতে পারে, কিন্তু এর অভীষ্ট লক্ষ্য সেই পুরুষটির নিজস্ব পরিমণ্ডলের বাহিরে। একটি পুরুষের উপস্থিতি, আপনার জন্য বা আপনার প্রতি তার কী করবার ক্ষমতা আছে, তার ইঙ্গিত দেয়। তার উপস্থিতি হতে পারে কৃত্রিম, এই অর্থে যে, সে আসলে ভণিতা করছে, যতটা যোগ্য হিসেবে নিজেকে সে উপস্থাপিত করেছে, ততটা যোগ্য সে আসলে নয়। কিন্তু তার এই ভণিতা সবসময়ই সেই শক্তি অভিমুখী, যা সে অন্যদের উপর ব্যবহার করে।

এর ব্যতিক্রম হচ্ছে, কোনো একজন নারীর উপস্থিতি, যা তার নিজের প্রতি তার নিজস্ব মনোভাবকেই প্রকাশ করে, এবং সেটাই নির্ধারণ করে দেয়, তার প্রতি অন্যরা কী ধরনের আচরণ করতে পারে বা পারে না। তার উপস্থিতি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় তার অভিব্যক্তিতে, কণ্ঠে, মতামতে, প্রকাশ ভঙ্গিমায়, পরিচ্ছদে, তার বাছাই করা পরিবেশে, রুচিতে - আসলেই সে এমন কিছু করতে পারে না, যা তার উপস্থিতির অংশ নয়। কোনো নারীর জন্য তার উপস্থিতি, তার পুরো অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত একটি অনুষঙ্গ, আর পুরুষদের

সেটাকে প্রায়শই নারীর শারীরিক অস্তিত্ব থেকে প্রবাহমান কোনো বৈশিষ্ট্য ভাবার প্রবণতা আছে, যেমন কোনো ধরনের তাপ বা গন্ধ আর স্বর্গীয় দ্যুতি।

নারী হিসেবে জন্ম নিতে কোনো একজন নারীকে জন্ম নিতে হবে পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণে, তার জন্য বরাদ্দ সীমাবদ্ধ কোনো পরিসরে। নারীদের সামাজিক উপস্থিতি গড়ে উঠেছে, সীমাবদ্ধ পরিসরে এই ধরনের অভিভাবকত্বের অধীনে তাদের বেঁচে থাকার উদ্ভাবনপটুতার একটি ফলাফল হিসেবে। কিন্তু এর মূল্য পরিশোধ করতে নারীকে তার সত্তাকে দ্বিবিভাজিত করতে হয়েছে। একজন নারীকে অবশ্যই অবিরামভাবে তার নিজের দিকে লক্ষ রাখতে হয়। প্রায় সারাক্ষণই সে নিজেই তার নিজের অস্তিত্বের সঙ্গী। যখন সে কোনো ঘরের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কিংবা তার পিতার মৃত্যুর শোকে ক্রন্দনরত, সে পারতপক্ষে মনে মনে তার সেই ভাবনাটি কখনোই এড়াতে পারে না যে, তাকে হাঁটতে বা কাঁদতে দেখা যাচ্ছে। খুব শৈশব থেকে তাকে শেখানো, আর বিশ্বাস করানো হয়েছে যে, নিরন্তর নিজেকে তার খতিয়ে দেখতে হবে ।

সুতরাং সে তার আপন সত্তায়, 'যে খতিয়ে দেখছে' বা 'নিরীক্ষক' আর 'যাকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে' বা 'নিরীক্ষিত', উভয়কে বিবেচনা করতে হয় দুটি উপাদান হিসেবে, যা সবসময়ই একজন নারী হিসেবে তার আত্মপরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অথচ স্বতন্ত্র দুটি অংশ।

সে যা তার সবকিছু এবং যা কিছু সে করছে সেটি তাকে জরিপ করতে হয়, কারণ অন্যদের কাছে তার উপস্থিতিও খতিয়ে দেখতে হয়, আর সর্বোপরি পুরুষদের সামনে কীভাবে সে উপস্থাপিত হচ্ছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা সাধারণত তার জীবনের সফলতা হিসেবে মনে করা হয়। তার নিজস্বতায় বেঁচে থাকার অনুভূতিটিকে অন্যদের দ্বারা তার সেই নিজস্বতাটি যেভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে সেই অনুভূতিটি প্রতিস্থাপিত করে।

পুরুষরা নারীদের সাথে কোনো আচরণ করবার আগেই তাদের খতিয়ে দেখে নেয়। এর পরিণতিতে, কীভাবে কোনো একজন পুরুষের কাছে, নারী কী রুপে আবির্ভূত হবে, সেই বিষয়টি এবং তার সাথে কীভাবে আচরণ করা হবে তা নির্ধারণ করে দিতে পারে। আর এই প্রক্রিয়ার উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ অর্জনের য় নারীকে অবশ্যই সেই বোধটাকেও ধারণ আর নিজের অস্তিত্বের অংশ করে নিতে হয়। নারী সত্তার যে অংশটি 'নিরীক্ষকের' ভূমিকা পালন করে সেটি, এর অপর অংশটি, অর্থাৎ যাকে নিরীক্ষা করা হয় বা 'নিরীক্ষিত', তার সাথে এমনভাবে আচরণ করে, যেন তা অন্যদের দেখিয়ে দেয় 'সম্পূর্ণ তার নিজের' প্রতি কেমন আচরণ সে প্রত্যাশা করে। আর তার এই নিজের প্রতি নিজের এই দৃষ্টান্তমূলক আচরণ তার উপস্থিতির মূলভিত্তি রচনা করে। তার উপস্থিতির পরিসীমায় কোন আচরণ অনুমতিযোগ্য আর কোনটি তা নয় সেটি প্রতিটি নারীর উপস্থিতি বা তার ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ করে । তার প্রতিটি কাজ - সেটির প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য বা অনুপ্রেরণা যা-ই হোক না কেন - তার সাথে কীভাবে আচরণ করা হবে বলে আশা করছেন তার ইঙ্গিত হিসেবে বুঝতে হবে। যদি কোনো নারী মেঝেতে একটি গ্লাস ছুড়ে ফেলে, তিনি নিজের ক্রোধের আবেগকে কীভাবে দেখছেন সেটি একটি উদাহরণ হবে, সুতরাং এছাড়াও সেটি ইঙ্গিত করে, তিনি ইচ্ছা পোষণ করছেন অন্যরা সেই আবেগ নিয়ে কীভাবে আচরণ

করবে। যদি কোনো পুরুষ সেই একই কাজ করেন, তার কাজটি হবে শুধু তার রাগের বহিঃপ্রকাশ। যদি কোনো রমণী একটি চমৎকার হাস্যরসাত্মক কৌতুকময় কিছু বলেন, স েটি তিনি তার নিজের ভিতরের একজন কৌতুকপ্রিয় মানুষের প্রতি কীভাবে আচরণ করছেন এবং সেই কারণে একজন কৌতুকপ্রিয় নারী হিসেবে তিনি অন্যদের কাছ থেকে কেমন আচরণ প্রত্যাশা করছেন তার একটি উদাহরণ হবে। শুধু একজন পরুষ কোনো কৌতুকের খাতিরে কৌতুক করতে পারে।

হয়তো কেউ বিষয়টিকে সহজ করে বলতে পারেন এভাবে, 'পুরুষরা কাজ করে ' আর 'নারীরা আবির্ভূত' বা দৃষ্টিগোচরীভূত হয়। পুরুষরা নারীদের দিকে তাকিয়ে দেখে। আর নারীরা তাদের নিজেদের দেখে অন্যরা কীভাবে তাদেরকে দেখছে। আর এটি পুরুষ আর নারীর মধ্যকার প্রায় সব সম্পর্ককেই শুধু নিয়ন্ত্রণই করে না, এছাড়াও নারীদের নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো কী হবে সেটিও নির্দিষ্ট করে। নারী তার নিজের সত্তার ভিতরের নারীদের সেই নিরীক্ষক একজন পুরুষ : কিন্তু যাকে সেই নিরীক্ষক নীরিক্ষা করছেন সেই অংশটি একজন নারী। এভাবে নারী নিজেকে রূপান্তর করে বস্তুতে - এবং আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে দেখার বস্তুতে : একটি দৃশ্যে।

ইউরোপীয় তৈলচিত্রের একটি শ্রেণিতে নারীরাই প্রধান এবং চির-পৌনঃপুনিকতাসহ আবির্ভূত হওয়া একটি বিষয়। সেই শ্রেণিটি হচ্ছে ন্যুড বা নগ্নতা। ইউরোপীয় এই নগ্নতার চিত্রকর্মগুলোয় আমরা বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আর প্রথাগত ধ্যানধারণার স্বরূপ উদঘাটন করতে পারি, যার মাধ্যমে দৃশ্য হিসেবে নারীদের দেখা এবং বিচার করা হতো ।

এই প্রথার প্রচলিত সংস্কৃতিতে প্রথম নগ্ন মানব মানবী, যাদের চিত্রকর্মে সৃষ্টি করা হয়েছিল তারা হচ্ছেন: আদম এবং হাওয়া (অ্যাডাম ও ইভ)। জেনেসিসে বর্ণিত সেই কাহিনীটা এখানে পুনরায় মনে করা যেতে পারে সঙ্গত কারণে:

> যখন নারী দেখেছিল বৃক্ষটি খাদ্য হিসেবে উত্তম এবং এটি দৃষ্টিনন্দন, এবং কাউকে জ্ঞানপ্রাপ্ত হতে এই বৃক্ষ কামনা করতে হবে, সে সেই বৃক্ষের ফল সংগ্রহ করে সেটি খেয়েছিল, এবং এছাড়া সে তার স্বামীকেও সেই ফল দিয়েছিল এবং সেও সেটি খেয়েছিল।
>
> এবং উভয়ের চোখ খুলে গিয়েছিল, এবং জানতে পেরেছিল যে তারা আবরণহীন উলঙ্গ। কয়েকটি ডুমুর পাতা একত্রে সেলাই করে তারা নিজেদের জন্য আচ্ছাদন তৈরি করেছিল। এবং প্রভু ঈশ্বর পুরুষটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল , 'তুমি কোথায় এখন?' এবং পুরুষটি উত্তরে বলেছিল,'আমি বাগানে তোমার কণ্ঠস্বর শুনে ভয় পেয়েছিলাম, কারণ আমি ছিল উলঙ্গ, নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম...'
>
> এবং নারীকে উদ্দেশ্য করে ঈশ্বর বলেন: 'আমি তোমার যন্ত্রণা বহুগুণে বর্ধিত করে দেবো, এবং তোমার প্রসবকালীন সময়ে কষ্টের সাথে তুমি সন্তানের জন্ম

দেবে, এবং তোমার কামনা হবে তোমার স্বামীর প্রতি নির্দেশিত এবং তোমার উপর সে কর্তৃত্ব করবে।'

এই কাহিনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় কী হতে পারে? তারা তাদের নগ্নতা নিয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন কারণ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবার পরিণতিতে তারা পরস্পরকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছিল। নগ্নতার সৃষ্টি হয় দর্শকের মনের গভীরে।

দ্বিতীয়, উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি আমাদের নজরে আসে সেটি হচ্ছে, এই ঘটনায় অপরাধী হিসেবে সব দায়ভার ন্যস্ত হয় নারীটির উপর, আর পুরুষের অধীনস্থ হয়ে থাকার শাস্তিটিও তার উপর আরোপিত হয়। নারীর ক্ষেত্রে পুরুষ হয়ে ওঠে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। মধ্যযুগীয় প্রথাগত ধারায় প্রায়শই এই কাহিনীটি পরিবেশন করা হয়েছে একের পর এক ঘটনাটির দৃশ্যাবলী অংকন করবার মাধ্যমে, যেন ধারাবাহিক কোন কার্টুন।

(পল ডি লিম্বর্গের আঁকা দ্য ফল অ্যান্ড এক্সপালশন ফ্রম প্যারাডাইস')

রেনেসাঁর সময় এই কাহিনীর মূল ধারাক্রমটি হারিয়ে গিয়েছিল এবং শুধু একটি মুহূর্তকে আমরা চিত্রায়িত হতে দেখি, আর সেটি হচ্ছে সেই লজ্জার মুহূর্ত। মানব যুগল ডুমুর পাতার আচ্ছাদন পরে আছে বা তাদের হাত দিয়ে লজ্জা আর বিনম্র কোনো ভঙ্গিমা করছে। কিন্তু এখন তাদের লজ্জা আর একে অপরের প্রতি ততটা বেশি নয় যতটা না সেটি নির্দেশিত তাদের দেখছে এমন কোনো দর্শকের প্রতি।

(মাবুসের অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ)

পরবর্তীতে এই লজ্জাটি এক ধরনের প্রদর্শনীতে পরিণত হয়।

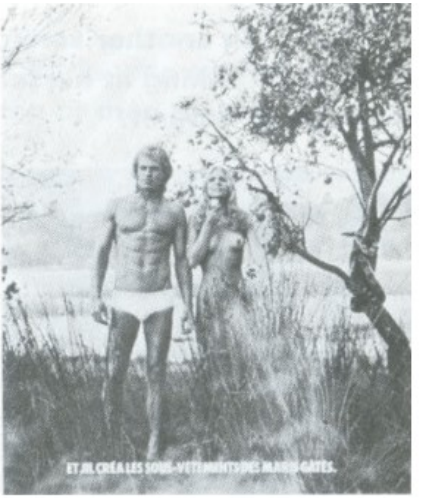

(ম্যাক্স স্লেভটের ‘দ্য কাপল’ এবং একটি আন্ডারওয়্যারের বিজ্ঞাপনচিত্র)

চিত্রকর্ম সৃষ্টির প্রথায় যখন আরো ধর্মনিরেপক্ষতা এসেছে, তখন নগ্ন চিত্রকর্ম সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী বিষয়বস্তু যুক্ত হবার পথটিও সুপ্রশস্ত হয়েছে। কিন্তু সব চিত্রকর্মগুলোয় যে ইঙ্গিতটির উপস্থিতি থাকে, সেটি হচ্ছে, এর বিষয়বস্তু (একজন নারী) সেখানে সচেতন যে কোনো দর্শক তাকে দেখছে।

সে আবরণহীন নয়, যেমনটি সে আসলে আবরণহীন।
সে ঠিক ততটাই আবরণহীন যেমন কোনো দর্শক তাকে দেখছে।

(তিনতরেত্তো'র সুজানা অ্যান্ড দি এল্ডারস)

প্রায়শই - যেমন, ‘সুজানা অ্যান্ড দি এলডার্স’ চিত্রকমটির জনপ্রিয় বিষয়বস্তুর মতো - এটাই সত্যিকারভাবে চিত্রকর্মটির মূল ভাবনা, গোপনে সুজানা স্নান করছে সেই দৃশ্যটি দেখতে আমরাও দর্শক হিসেবে পৌঢ়দের সাথে যোগ দেই আর সুজানাও পেছনে আমাদর দিকে তাকিয়ে দেখছে যে, আমরা তাকে দেখছি।

একই বিষয় নিয়ে তিনতরেত্তো’র আঁকা অপর একটি সংস্করণে আমরা দেখি, সু জানা নিজেকে আয়নার দেখছে, এভাবে সে নিজেও লুকিয়ে তাকে দেখতে থাকা দর্শকদের সাথে অংশগ্রহণ করে।

(তিনতরেত্তো'র সুজানা অ্যান্ড দি এল্ডারস)

আয়নাকে প্রায়ই চিত্রকলায় ব্যবহার করা হয়েছে নারীর অহংকারের প্রতীক হিসেবে। যদিও এই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করবার প্রক্রিয়াটি মূলত ভণ্ডামিরই পরিচয়।

আপনি একটি আবরণহীন নারীর চিত্র এঁকেছেন, কারণ আপনি তাকে সেভাবে দেখতে উপভোগ করেন, আর আপনি তার হাতে একটি আয়না ধরিয়ে দিয়েছেন এবং চিত্রকর্মটিকে নাম দিয়েছেন ‘ভ্যানিটি’ বা দম্ভ, আর এভাবে আপনি সেই নারীকে নৈতিক দৃষ্টিতে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করছেন, অথচ যার আবরণহীনতা আপনি এঁকেছেন আপনার নিজের উপভোগের বস্তু হিসেবে।

আয়না ব্যবহারের সত্যিকার কারণ মূলত ভিন্ন কিছু। এটি ব্যবহৃত হচ্ছে নারীকে প্রথম এবং প্রধানত তার নিজেকে একটি দৃশ্য হিসেবে ব্যবহার করবার প্রচেষ্টায় তার নীরব সম্মতি আদায় করে নিতে।

(মেমলিং, ভ্যানিটি)

দ্য জাজমেন্ট অব প্যারিস চিত্রকর্ম আরেকটি মূলভাবনা প্রকাশ করে, এখানেও সেই অলিখিত ধারণাটি আমরা দেখতে পাই, কোনো পুরুষ বা পুরুষদের একটি দল আবরণহীন নারীদের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু এখন একটি বাড়তি বিষয় এখানে সংযুক্ত হয়েছে। সেটা হলো একটি বিচারিক প্রক্রিয়া। প্যারিস তার দৃষ্টিতে সবচেয়ে সুন্দরী নারীকে পুরষ্কার হিসেবে আপেলটি নিবেদন করে, এভাবে সৌন্দর্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও বিচারযোগ্য হয়ে ওঠে (আজকের দিনে প্যারিসের সেই বিচারিক প্রক্রিয়া পরিণত হয়েছে সুন্দরী প্রতিযোগিতায়)। যাদের সুন্দর বলে বিচার করা হবে না, তারা সুন্দর নয়, আর যারা সুন্দর, তাদের পুরষ্কৃত করা হয়।

লুকাস ক্রানাচের ‘দ্য জাজমেন্ট অব প্যারিস’

রুবেন্সের দ্য জাজমেন্ট অব প্যারিস

কোনো একজন বিচারককে সেই পুরষ্কারটির মালিক হতে হবে, অর্থাৎ বলতে চাইছি, পুরষ্কারটি তার হাতের নাগালেই থাকবে। রাজা দ্বিতীয় চার্লস, শিল্পী লেলিকে একটি গোপন চিত্রকর্ম সৃষ্টি করবার দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন, ঐতিহ্যবাহী প্রথার খুবই সাধারণ বৈশিষ্ট্যসূচক একটি চিত্রকর্ম। নাম মাত্রে এটা হতে পারে 'ভিনাস ও কিউপিড' কিন্তু আসলে এটি রাজার রক্ষিতাদের মধ্যে অন্যতম একজনের প্রতিকৃতি, নেল গোয়েইন, সেখানে আমরা দেখতে পাই, তার আবরণহীনতার দিকে তাকিয়ে থাকা দর্শকদের দিকে নেল গোয়াইন নিষ্ক্রিয়ভাবে তাকিয়ে আছেন।

(লেলির 'প্রোর্টেইট অব নেল গোয়েইন অ্যাস ভিনাস')

যদিও এই আবরণহীনতা তার নিজস্ব কোনো অনুভূতির প্রকাশ নয়, এটি তার মালিকের অনুভূতি বা চাহিদার প্রতি শর্তহীন আত্মসমর্পন (নারী এবং এই চিত্রকর্ম - উভয়ের যে মালিক।) এবং এই চিত্রটি রাজা যখনই অন্য কাউকে দেখিয়েছেন, এই আনুগত্যটি তিনি প্রদর্শন করেছেন, এবং যা তার অতিথিদের ঈর্ষান্বিত করে তুলেছে।

অন্যান্য অ-ইউরোপীয় সংস্কৃতির ধারাটি এখানে লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ — ভারতীয়, আফ্রিকার, আমেরিকার প্রাককলোম্বিয় শিল্পকলায় আবরণহীনতা কখনোই এভাবে আলস্যপূর্ণ নয়, এবং যদিও এই সব সংস্কৃতির ধারায় সৃষ্ট চিত্রগুলোর মূল ভাবনা ছিল যৌন আকর্ষণ, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেখানে দুজন মানুষের সক্রিয় যৌন ভালোবাসার দৃশ্য দেখা যায়। যেখানে নারী পুরুষের মতোই সক্রিয়, একজনের ক্রিয়ায় অন্যজন নিমগ্ন।

(বিষ্ণু এবং লক্ষ্মী, একাদশ শতাব্দী এবং পেরুর মচিকা মৃৎশিল্প)

জঙ্গলে রাধা-কৃষ্ণ, ১৭৭৫, হিমাচল প্রদেশ

ইউরোপীয় প্রথায় শিল্পকলায় আবরণহীনতা (ন্যাকেডনেস) আর নগ্নতার (ন্যুড) মধ্যে পার্থক্যটি এখন আমরা অনুধাবন করতে শুরু করেছি। কেনেথ ক্লার্ক তার 'দ্য ন্যুড' বইটিতে এ বিষয়ে তার মতামত প্রকাশ করেছিলেন এভাবে, 'আবরণহীন হওয়া মানে শুধু বস্ত্রের আবরণ সরিয়ে ফেলা, অপর দিকে নগ্নতা হচ্ছে শিল্পের একটি ফর্ম বা রূপ'। তার ভাষ্যমতে, নগ্নতা কোনো চিত্রকর্মের সূচনা বিন্দু নয় বরং এটি দেখার একটি পদ্ধতি যা চিত্রকর্মটি অর্জন করে। কিছু ক্ষেত্র অবধি বিষয়টি সত্যি - যদিও একজন নগ্ন কাউকে দেখবার উপায়গুলো আবশ্যিকভাবে শিল্পকলার পরিসরেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়: নগ্ন আলোকচিত্র আছে, নগ্ন অঙ্গভঙ্গি আছে। যা সত্য সরটা হচ্ছে, নগ্নতা সবসময়ই নিয়মতান্ত্রিকতায় আবদ্ধ হয়ে আছে - এবং এই সব নিয়মের কর্তৃত্বের উৎস শিল্পকলার কিছু নির্দিষ্ট ঐতিহ্য।

এই নিয়ম বা প্রথাগুলো আসলে কী? নগ্নতা আসলে কী প্রকাশ করছে? এর গুরুত্বটাই বা কী? শুধু শিল্পকলার একটি রূপ হিসেবে এর ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ। কারণ খুব স্পষ্টভাবেই নগ্নতা অতীত আর অভিজ্ঞতালব্ধ যৌনতার সাথে সবসময় সংশিষ্ট।

আবরণহীন হওয়া মানে নিজের স্বরুপ ফিরে যাওয়া।

নগ্ন হতে হলে সেই আবরণহীনতাকে দেখতে হবে অন্য কাউকে, অথচ আবরণহীন যে তার নিজের কাছে সেটি ধরা পড়বে না। নগ্ন হিসেবে চিহ্নিত হতে হলে কোনো আবরণহীন শরীরকে বস্তুনিষ্ঠভাবে একটি বিষয়বস্তু হিসেবে দেখতে হবে (কোনো একটি বস্তু হিসেবে এর দৃশ্যমানতা, বস্তু হিসেবে এর ব্যবহারকে প্ররোচিত করে)। আবরণহীনতা নিজেকে উন্মোচন করে। নগ্নতা প্রদর্শনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

আবরণহীন হওয়া মানে সবধরনের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করা।

আর প্রদর্শনের জন্য, নিজের ত্বকের আচ্ছাদন উপস্থাপিত হচ্ছে, নিজের শরীরের চুল ছদ্মবেশে রূপান্তরিত হয়, যা সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে কখনোই বাতিল করা যায় না। নগ্ন চিরকালের জন্য আবরণহীন না হওয়ার অভিশাপে অভিশপ্ত। নগ্নতাই এক ধরনের পোষাক।

গড়পড়তা ইউরোপীয় নগ্ন তৈলচিত্রের মুখ্য চরিত্রটিকে কখনোই আঁকা হয় না। যিনি এই চিত্রকর্মের সামনে দাড়িয়ে থাকা একজন দর্শক, এবং ধরে নেয়া হয় যে, তিনি হবেন একজন পুরুষ। সবকিছু তার প্রতি নির্দেশিত ; সবকিছু যা ঘটছে সেখানে তার সবকিছুকে এমনভাবে অবশ্যই উপস্থাপন করতে হবে যে সেটি তার জন্য ঘটছে। তার

জন্য সেখানে উপস্থিত চরিত্রগুলো তাদের নগ্নতাকে ধারণ করে আছে। কিন্তু তিনি, সংজ্ঞানুযায়ী, সেখানে একজন আগন্তুক, যিনি এখনো তার পোষাক পরে আছেন।

ব্রোনজিনো'র 'এ্যালেগরি অব টাইম অ্যান্ড লাভ' চিত্রকর্মটির কথা ধরা যাক, যে জটিল প্রতীকী রূপগুলো এই চিত্রের নেপথ্যে আছে সেগুলো আর আমাদেরকে সেভাবে ভাবায় না, কারণ এই রহস্যগুলো প্রথমত এর যৌন আবেদনময়তাকে বিন্দুমাত্র কমায় না। এটি যৌন-প্ররোচনা প্রদানকারী একটি চিত্রকর্ম ভিন্ন আর কিছু নয়। তৈলচিত্রটি ফরাসী রাজাকে উপহার স্বরুপ পাঠিয়েছিলেন ফ্লোরেন্সেরর গ্রান্ড ডিউক।

(ব্রোনজিনের 'ভিনাস, কিউপিড, টাইম অ্যান্ড লাভ')

যে বালকটি একটি বালিশের উপর তার হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে একজন রমনীকে চুম্বন করছে সে কিউপিড। রমনীটি ভিনাস। কিন্তু যেভাবে সে তার (ভিনাস) শারীরিক ভঙ্গিমা প্রকাশ করে আছে এর সাথে তাদের চুম্বনের কোনো সম্পর্ক নেই। তার দেহভঙ্গিমা যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, সেটি এই চিত্রকর্মটি যে পুরুষ দর্শক দেখছেন তাকে প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে আঁকা হয়েছে। এই চিত্রটি আঁকা হয়েছে দর্শনের যৌনতার প্রতি আবেদন সৃষ্টি করতে। রমণীর যৌনতার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। (এখানে ও ইউরোপীয় প্রথাগত চিত্রশিল্পে নারীদের শরীরে কোনো চুল দেখানো হয় না, যা একই উদ্দেশ্যে কাজ করে। শরীরের চুল যৌন সক্ষমতা আর যৌন আবেগের সাথে সংশ্লিষ্ট। নারীর যৌন আকাঙ্ক্ষাকে ন্যুনতম মাত্রায় রাখার প্রয়োজন বোধ করা হয়, যেন এর পুরুষ দর্শক মনে করতে পারে এই ধরনের আবেগময় আকাঙ্ক্ষার প্রতি একমাত্র তারই একচ্ছত্র অধিকার আছে।) নারী হচ্ছে সেই ক্ষুধা নিবৃত্তি করবার উপকরণ, তবে তার নিজের সেই ধরনের কোনো ক্ষুধা থাকতে নেই।

এখানে, এই দুই নারী অভিব্যক্তি লক্ষ করে দেখুন, একজন শিল্পী অঁঙগ্রের আঁকা একটি বিখ্যাত চিত্রকর্মের মডেল এবং অন্যজন একটি নারীবিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত আলোকচিত্রের একজন মডেল।

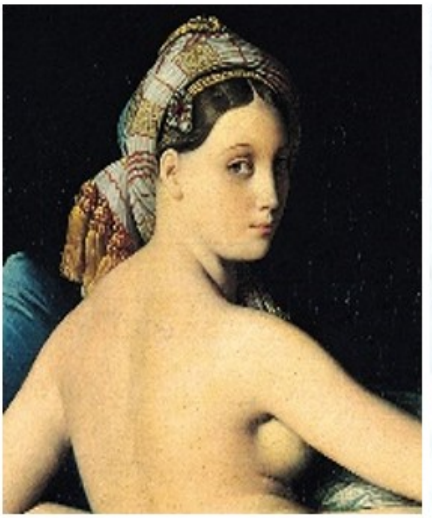

(অঁঙগ্রের ‘লা গ্রান্ডে ওডালিস্ক’)

তাদের দুজনের অভিব্যক্তি কি লক্ষণীয়ভাবে একই রকম নয়? এই পরিমিত মাত্রায় মোহনীয় অভিব্যক্তি হচ্ছে কোনো পুরুষের প্রতি নির্দেশিত তার প্রত্যুত্তর, যে কিনা তার দিকে তাকিয়ে আছে, এমন ভাবেই কোনো একজন নারী তা কল্পনা করছে, যদিও পুরুষটি সেই নারীর কাছে অপরিচিত। নীরিক্ষীত হবার জন্য সে তার নারীত্বকে নিবেদন করছে ।

এটাও সত্যি যে চিত্রকর্মে, মাঝে মাঝে একজন পুরুষ প্রেমিককে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

কিন্তু তার সঙ্গী নারীটির দৃষ্টি কদাচিৎ তার প্রতি নিবদ্ধ থাকে। প্রায়শই নারী চরিত্রটি তার থেকে অন্য দিকে বা চিত্রকর্মের বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে অন্য একজনের দিকে, যে নিজেকে মনে করে তার সত্যিকারের প্রেমিক-দর্শক-মালিক।

(ভন আখেনের বাক্কাস, সেরেজ অ্যান্ড কিউপিড')

ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার জন্য সৃষ্ট পর্নোগ্রাফি তৈলচিত্র একটি বিশেষ শ্রেণি ছিল (বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে), যেখানে যুগল যৌনসঙ্গম করছে এমন বিষয় জায়গা করে নিয়েছিল। এমনকি এই সব চিত্রকর্মের সামনে দাড়ালেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে দর্শক -মালিক তার কল্পনায় এই অন্য পুরুষটিকে সরিয়ে দেয় বা সেই জায়গায় সে নিজেকে দেখতে পায়। এর ব্যতিক্রম দেখি আমরা অইউরোপীয় শিল্পকলায়, যেখানে বহু সংখ্যক যুগল একসাথে যৌনসঙ্গম করছে এমন একটি ধারণার উদ্রেক করে।

‘আমাদের সবারই আছে এক সহস্র হাত, এক সহস্র পা, আমরা কখনোই একা যাব না।’

অধিকাংশ রেনেসাঁ পরবর্তী ইউরোপীয় শিল্পকলায় যৌনদৃশ্যগুলো আঁকা হয়েছে সামনে থেকে, হয় আক্ষরিক অর্থে অথবা রূপকার্থে, কারণ যৌনতার প্রধান চরিত্র সেই সব দর্শক-মালিকেরা, যারা এর দিকে তাকিয়ে দেখছে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পকলায় এই ধরনের পুরুষ চাটুকারিতার অস্বাভাবিকতা এর চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিলো উনবিংশ শতাব্দীতে।

(বুগেরোর ‘লে অরিয়াদেস’)

রাষ্ট্রের শাসন কাঠামোয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পুরুষরা এই ধরনের চিত্রকর্মের নীচেই তাদের আলোচনা আর দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এসেছেন। যখনই কারো মনে হয়েছে তাকে বোকা বানানো হয়েছে, তিনি মাথা উঁচু করে উপরে দেয়ালে টাঙ্গানো তৈলচিত্রে সান্ত্বনা খুঁজেছেন। তিনি সেখানে যা দেখেছেন, তা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে তিনি পুরুষ।

ইউরোপীয় সংস্কৃতির নগ্ন তৈলচিত্রের উদাহরণে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেখানে উপরে এই পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তার খুব সামান্যই প্রযোজ্য। সেই সব

চিত্রকর্মগুলো আসলেই আর নগ্ন কোনো চিত্রকর্ম নয় - সেগুলো শিল্পকলার প্রচলিত প্রথাকে ভেঙ্গেছে। সেগুলো শিল্পীর প্রিয়তমাকে বিষয়বস্তু করে আঁকা চিত্রকর্ম, যে নারীদের তারা ভালোবেসেছেন, কম বেশি সবাই আবরণহীন। শত সহস্র নগ্ন চিত্রকর্মের উদাহরণ সেগুলো প্রচলিত ধারার প্রতিনিধিত্ব করছে তাদের মধ্যে হয়তো এই ব্যতিক্রমের সংখ্যা একশও অতিক্রম করবে না। প্রতিটি ক্ষেত্রে কেনো বিশেষ নারীর প্রতি শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, যাকে তিনি আঁকছেন, তা এতটাই শক্তিশালী যে সেখানে অন্য দর্শকের জন্য কোনো জায়গা রাখা হয় না। শিল্পীর দৃষ্টি তার আঁকা নারীকে বেঁধে রাখে তার সাথে এমনভাবে, তারা যেন পাথরে খোদাই করা কোনো যুগল, যাদের বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। দর্শক তাদের সেই সম্পর্কটিকে দেখতে পারেন- কিন্তু এর বেশি তার আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই: তাকে জোরপুর্বক বাধ্য করা হয় সে আসলেই যা অর্থাৎ একজন বহিরাগত হিসেবে তার নিজেকে চিহ্নিত করতে। তিনি কিছুতেই নারীটি তার জন্যই আবরণহীন হয়েছেন এমন কোন বিশ্বাস দ্বারা নিজেকে প্রবঞ্চিত করতে পারবেন না। তিনি কিছুতেই নারীটিকে একটি নগ্ন রূপ দিতে পারবেন না। যেভাবে শিল্পী তাকে একেঁছেন, সেই চিত্রের কাঠামোর মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে সেই নারীটির ইচ্ছা ও তার মনোবাসনা, তার শরীরের আর চেহারার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিতে।

(রেমব্রান্টের ডানাই)

আবরণহীনতা পরস্পর বিপরীতমুখী ধারণাটিকে গতানুগতিক এবং ব্যতিক্রম যে-কোনো একটি প্রথাগত ধারায় সংঙ্গায়িত করা যেতে পারে, কিন্তু আবরণহীনতাকে চিত্র ধারণ করবার ক্ষেত্রে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেটি প্রথম দৃষ্টিতে যতটা সরল অনুভূত হয় ততটা সরল আসলে নয়।

কোনো যৌনক্রিয়ায় বাস্তবে মূলত আবরণহীনতার কী ভূমিকা আছে? বস্ত্র সংস্পর্শ আর যৌনক্রিয়ার গতিময়তাকে ব্যাহত করে। কিন্তু মনে হতে পারে যে এর একক অধিকারেই আবরণহীনতার একটি ইতিবাচক দৃশ্যগত মূল্য আছে: আমরা অন্যদের আবরণহীন দেখতে চাই: অন্যরা আমাদের সামনে তাদের আবরণহীনতার দৃশ্য নিবেদন করে এবং আমরা দ্রুত সেটি অনুধাবন করতে পারি - সেটি প্রথমবার নাকি শততম বার, কখনো তা আদৌ বিবেচনা না করে। অন্যদের এই দৃশ্যের কী মূল্য আছে আমাদের কাছে , সেই পূর্ণ উন্মোচনের মুহূর্তে এটি কীভাবে আমাদের কামনাকে প্রভাবিত করে?

তাদের আবরণহীনতা একটি নিশ্চিত প্রমাণ হিসেবে কাজ করে এবং স্বস্তির খুব শক্তিশালী একটি অনুভূতির উদ্রেক করে। অন্য যে-কোনো নারীর মতোই সে: বা অন্য যে -কোনো পুরুষের মতোই একজন পুরুষ; পরিচিত যৌনপ্রক্রিয়ার অপূর্ব সরলতায় আমরা আপ্লুত হই।

অবশ্য আমরা সচেতনভাবে এর ব্যতিক্রম কিছু ভাবি না: অবচেতনে সমকামী কামনা (বা অবচেতনে বিষমকামী কামনা যদি যুগল সমকামী হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে) আংশিকভাবে হয়তো পৃথক পৃথকভাবে তাদের ভিন্ন কিছু প্রত্যাশার কারণ হতে পারে। কিন্তু স্বস্তির ব্যাপারটি অবচেতনের বিষয়টি আমলে না এনেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

অন্যকিছু ঘটবে এখানে এমন প্রত্যাশা করি না আমরা, তবে আমাদের অনুভূতির জটিলতা ও অত্যাবশ্যকীয়তা একটি অনন্য অনুভূতির জন্ম দেয়, যা অন্যের দৃশ্য, সে পুরুষ বা নারী হিসেবে যেমন, সেই ধারণাটি এখন দূর করে দেয় আমাদের চিন্তায়। তারা যতটা না ব্যতিক্রম, তার চেয়েও তারা তাদের একই লিঙ্গের বাকি অন্য সবার মতোই। আর এই অনুধাবন প্রক্রিয়ার মধ্যেই আছে উষ্ণতা আর মিত্রভাবাপন্নতা-শীতল এবং নৈর্ব্যক্তিকতার বিপরীত-আবরণহীনতার নামহীনতা।

কেউ চাইলে এটি অন্যভাবেও প্রকাশ করতে পারেন: যে মুহূর্তে আবরণহীনতা প্রথমবারের মতো অভিজ্ঞতা লব্ধ হয়, আটপৌরে সাধরণ একটি উপাদান এর সাথে যুক্ত হয়: যে উপাদানটি অস্তিত্ব আছে, তার কারণ শুধু আমাদের সেটি প্রয়োজন আছে।

সেই মুহূর্ত অবধি যখন অপর পক্ষ কম বেশি রহস্যময় ছিল। ভদ্রতার আচরণগুলো শুধু নীতিপরায়ণ বৈশিষ্ট্যসূচক বা ভাবপ্রবণই নয় বরং যুক্তিযুক্ত হবে যদি রহস্যময়তা হারিয়ে যাবার বিষয়টি চিহ্নিত করতে পারি। এবং এই রহস্যময়তা হারিয়ে যাবার ব্যাখ্যাটি হয়তো বহুলাংশে দৃশ্যগত মনে হতে পারে। অনুধাবন করার মনোযোগ চোখ, মুখ, ঘাড়, হাত থেকে সরে যায় - যাদের প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশের জন্য এতটাই দক্ষ, যে ব্যক্তিত্ব তারা প্রকাশ করছে তা হতে পারে বহুমাত্রার - দৃষ্টি এসব কিছু থেকে সরে যায় যৌন অংশের প্রতি, যা গড়ে ওঠা প্রস্তাব করছে সম্পূর্ণভাবে আকর্ষণীয় তবে একক

একটি প্রক্রিয়া হিসেবে। অপরপক্ষ সেখানে হ্রস্ব কিংবা উচ্চ কোনো স্থানে অধিষ্ঠিত হয় - যেটা আপনি পছন্দ করেন- তাদের প্রাথমিক যৌনতার শ্রেণিবিভাগে: পুরুষ অথবা নারী।

আমাদের স্বস্তি হচ্ছে প্রশ্নাতীত একটি বাস্তবতাকে খুঁজে পাওয়ার স্বস্তি যার প্রত্যক্ষ চাহিদার কাছে আমাদের পূর্ববর্তী অতিমাত্রায় জটিল সচেতনতাটিকে এখন অবশ্যই নতি স্বীকার করতে হবে।

আমাদের সেই মামুলী সাধারণত্ব প্রয়োজন, যা আমরা উন্মোচনের প্রথম মুহূর্তে অনুভব করেছি, কারণ এটি আমাদের বাস্তবতায় স্থিতিশীল করে। কিন্তু এটি তার চেয়েও বেশি কিছু করে। এই বাস্তবতা, খুব অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত প্রবাদতুল্য যৌনক্রিয়ার প্রতিশ্রুতি নিবেদন করে এবং একই সাথে সম্মিলিতভাবে অনুভব করা আত্মগত যৌনানুভূতির সম্ভাবনাও নিবেদন করে।

রহস্য অপসারিত হয় একটি যৌথ রহস্যময়তা সৃষ্টির উপায় নিবেদন করবার সাথে যুগপতভাবে। এর ধারাক্রমটি হলো, ব্যক্তিক - নৈর্ব্যক্তিক - দ্বিগুণ মাত্রায় ব্যক্তিক।

এখন আমরা যৌন আবরণহীনতার স্থিরচিত্র নির্মাণের জটিলতা বুঝতে সক্ষম হচ্ছি। কোনো একটি ঘটে যাওয়া যৌনক্রিয়ার অভিজ্ঞতায় আবরণহীনতা একটি প্রক্রিয়া মাত্র, কোনো একটি অবস্থা নয়। যদি সেই প্রক্রিয়ার কোনো মুহূর্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এর ছবি মনে হবে মামুলী, এবং এর মামুলীত্ব তীব্র আবেগময় কাল্পনিক দুটি অবস্থানের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করবার দায়িত্ব নেবার পরিবর্তে নিরুত্তাপ নিষ্প্রাণ করে তুলবে। একটি কারণ, যৌন আবেদনে বাঙ্গময় আবরণহীন কোনো নারীর আলোকচিত্র কেন তৈলচিত্র অপেক্ষা আরো দুর্লভ। আলোকচিত্রীর জন্য সবচেয়ে সহজ সমাধান হচ্ছে সেই বিষয়বস্তুকে নগ্নতায় রূপান্তরিত করা, যা দৃশ্য আর দর্শককে একইভাবে সাধারণীকৃত করে যৌনতাকে বৈশিষ্ট্যহীন করে তোলে, এবং কামনাকে রূপান্তরিত করে কল্পনায়।

আসুন এবার আবরণহীন কোনো নারীর একটি ব্যতিক্রমী তৈলচিত্র পরীক্ষা করে দেখি, এটি রুবেন্সের আঁকা একটি তৈলচিত্র, যার বিষয়বস্তু রুবেন্সের তরুণী দ্বিতীয় স্ত্রী, যাকে তিনি অপেক্ষাকৃত বেশ বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করেছিলেন।

আমরা তাকে দেখতে পাই তার শরীরটি ভিন্ন দিকে ঘোরানোর প্রক্রিয়ারত একটি ভঙ্গিমায়, তার পশমের চাদরটি কাধ থেকে প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, সে যেভাবে দাড়িয়ে আছে, সেভাবে বড় জোর এক সেকেন্ডের বেশিক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে পারার কথা নয়। আপাতদৃষ্টিতে হালকাভাবে অনুভূত হচ্ছে যে তার চিত্রটি আলোকচিত্রের মতোই তাৎক্ষণিক । কিন্তু আরো গভীর অর্থে, এই তৈলচিত্রটি ধারণ করছে সময় এবং সেই সময়ের অভিজ্ঞতাটিকে। খুব সহজেই কল্পনা করা যায় তার কাধের উপর পশমী চাদরটি জড়ানোর কিছু এক মুহূর্ত আগে তার শরীরে কোনো আবরণ ছিল না, সম্পূর্ণ উন্মোচনের মুহূর্তটির আগের ও পরের মুহূর্তের ধারাবাহিক পর্যায়গুলো পরস্পরের সাথে মিশে গেছে এদের নিজস্ব সীমা অতিক্রম করে। সে যে কোনো একটি বা সবগুলোর মুহূর্তের অংশ হতে পারে একই সাথে।

(রুবেন্সের ‘হেলেন ফোরমন্ত ইন এ ফার কোট’)

তার শরীর আমাদের মুখোমুখি হয়, কোনো তাৎক্ষণিক দৃশ্য হিসেবে নয় বরং একটি অভিজ্ঞতা হিসেবে - চিত্রকরের অভিজ্ঞতা হিসেবে। কেন? কিছটা উপরিদৃষ্টে এই চিত্রে বন্দি কাহিনীটির কারণে: তার এলোমেলো চুল, তার চোখের অভিব্যক্তি সব শিল্পীর প্রতি নির্দেশিত। তার ত্বকের অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা, যে কোমলতার সাথে এটি আঁকা হয়েছে। কিন্তু গভীরতর কারণ মূলত পোষাকী। আর উপস্থিতি আক্ষরিকার্থে নতুন করে গড়ে উঠেছে শিল্পীর নিজস্ব আত্মগত মননের মাধ্যমে। তার গায়ে জড়ানো পশমী চাদরের নীচে, তার শরীরের উপরিভাগ এবং তার পা একসাথে মিলিত হয় না কখনো। তার উরুর একপাশে সরে গেছে অতিরিক্ত প্রায় নয় ইঞ্চির মত বা দিকে, তার কোমরে যুক্ত হবার জন্য।

রুবেন্স সম্ভবত এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা করেননি, এবং কোনো দর্শকও সচেতনভাবে বিষয়টি লক্ষ নাও করতে পারেন। বিষয়টি যদিও এমনিতে গুরুত্বপূর্ণ নয়, মূল বিষয়টি হচ্ছে, এটি কী অনুমোদন করছে। এটি সুযোগ করে দিয়েছে শরীরকে অসম্ভাব্যভাবে গতিময় হবার জন্য। এর বোধগম্যতা শুধু আর নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এটি স¤প্রসারিত হয় শিল্পীয় অভিজ্ঞতায়। আরো সুনির্দিষ্টভাবে এটি শরীরের উপরের এবং নীচের অর্ধাংশটি পৃথকভাবে এবং বিপরীত দিকে ঘুর্ণনের অনুমতি দিচ্ছে, যৌনতার কেন্দ্রর চারপাশে, যে কেন্দ্রটি এখানে লুকানো: শরীরের উপরের অংশ ঘুরছে ডান দিকে এবং পাগুলো বাম দিকে। আর একই সাথে গোপন যৌনতার কেন্দ্রটি এই চিত্রটির চারপাশের অন্ধকারের সাথে সুংযুক্ত হয়ে মিলে গেছে গাঢ় পশমের আচ্ছাদনের মাধ্যমে। তাই মনে হচ্ছে এই অন্ধকারের মধ্যে এবং অন্ধকারকে ঘিরে ঘূর্ণায়মান নারীটি তার যৌনতার একটি প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে।

একটি একক মুহূর্তকে সম্প্রসারিত করবার আবশ্যিকতা আর স্বীকৃত আত্মগত অনুভূতি ছাড়াও, যা আমরা দেখছি, কোনো আবরণহীন নারীর সুন্দর বড় মাপের কোনো যৌনতার চিত্রকর্মের জন্য আরো একটি বাড়তি উপাদান আবশ্যক। সেটি হচ্ছে আটপৌরতা বা সাধারণত্ব, যা অবশ্যই ছদ্মবেশহীন প্রকাশ্য হতে হবে, তবে তা যেন উৎসাহ শীতল করে না দেয়। আর কোনো একজন গুপ্তস্থান থেকে যৌনকর্ম দেখে তৃপ্ত হওয়া কারো সাথে কোনো প্রেমিকের এটাই হচ্ছে পার্থক্য। রুবেন্সের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার মতো করে আঁকা হেলেন ফোরমন্টের চামড়ার নীচে পেলব স্ফীত মেদবহুল মাংসল শরীরে সেই সাধারণত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে, যা কিনা যে-কোনো প্রচলিত বা আদর্শ প্রথা ভেঙ্গেছে আর তার অসাধারণতম বৈশিষ্ট্যগুলো নিবেদন করবার নিমিত্তে নিরন্তরভাবে (তার কাছে) প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ইউরোপীয় তৈলচিত্রে নগ্নতা সাধারণত উপস্থাপন করা হয়ে থাকে ইউরোপীয় মানবতাবাদের মূলমন্ত্রের একটি প্রশংসনীয় অভিব্যক্তি হিসেবে। আর সেই প্রাণময় সত্তাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। এবং খুবই উচ্চমাত্রার সচেতনতাপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের আবির্ভাব বাদে প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম (আবরণহীন কোনো রমণীর খুবই ব্যক্তিগত চিত্র) কোনো কিছু কোনোদিনও আঁকা হতো না। তারপরও এই ধারার একটি স্ববিরোধীতাও প্রকাশ করে, যা এটি নিজে সমাধান করতে ব্যর্থ। অল্প কিছু শিল্পী স্বভাবজাতভাবে এই বিষয়টি শনাক্ত করতে পেরেছিলেন এবং এই স্ববিরোধীতার সমাধান করেছিলেন নিজেদের মতানুযায়ী। কিন্তু প্রচলিত ধারার সাংস্কৃতিক পরিভাষায় তাদের কোনো সমাধানই গৃহীত হয়নি কখনো।

খুব সরলভাবে সেই স্ববিরোধিতার বর্ণনা দেয়া যেতে পারে। একদিকে শিল্পী, চিন্তাবিদ, পৃষ্ঠপোষক, মালিকদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা : অপরদিকে যে ব্যক্তিটি, সেই নারীটি, যে তাদের সব কর্মকাণ্ডের বিষয়বস্তু - তার সাথে আচরণ করা হচ্ছে যেন কোনো দ্রব্য বা নৈর্ব্যক্তিক কোনো ধারণা। ডুরার বিশ্বাস করতেন যে, আদর্শ নগ্ন সৃষ্টি করবার জন্য কোনো একটি শরীর থেকে মুখমণ্ডল, অন্য কোনো শরীর থেকে স্তন, তৃতীয় কোনো শরীর থেকে

পা, চতুর্থ থেকে কাধ, পঞ্চম থেকে হাত, এমন করে নানা শরীর থেকে সংগৃহীত উপাদান সংমিশ্রণে তৈরি করা উচিৎ।

(ডুরারের 'ম্যান ড্রইং রিক্লাইনিং উইম্যান')

এর ফলাফল পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে। কিন্তু এই অনুশীলন বিস্ময়করভাবে নির্বিকার সেই ধারণাটি পোষণ করে - একজন মানুষ আসলেই কী সেই সব অসংখ্য শরীরের মধ্যে।

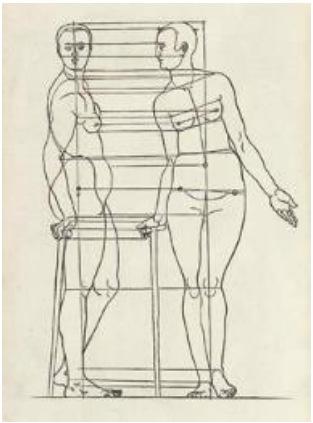

(ডুরারের কাঠখোদাই)

ইউরোপীয়দের নগ্ন চিত্রকলার ধারায় শিল্পী এবং দর্শক-মালিক সাধারণত পুরুষ এবং যাকে কোনো দ্রব্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় তিনি সাধারণত নারী। এই অসম সম্পর্কটি আমাদের সংস্কৃতির এতো গভীরে প্রোথিত যে এটি এখনো বহু রমণীর চেতনা নির্মাণ করে। তারা তাদের নিজেদের প্রতি সেই আচরণটি করে যা পুরুষরা তাদের প্রতি করে। পুরুষের মতোই তারা তাদের নারীত্বকে নীরিক্ষা করে।

আধুনিক শিল্পকলায় নগ্ন চিত্রকলা শ্রেণিটি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখায় পরিণত হয়েছে। শিল্পীরা নিজেরাই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন। এই

বিষয়ে এবং আরো অনেক বিষয়ে শিল্পী এডুয়ার্ড মানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকালে প্রতিনিধিত্ব করছেন। কেউ যদি তার 'অলিম্পিয়া' চিত্রকর্মটি, টিশানের মূল চিত্রকর্মটির সাথে তুলনা করে দেখেন, তিনি সেখানে একটি নারীকে প্রচলিত কাঠামোয় তার ভূমিকায় দেখতে পাবেন, আর তারা সেই ভূমিকাকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন, খানিকটা বলা যেতে পারে প্রতিবাদী রূপে।

(টিশানের 'দ্য ভিনাস অব উরবিনো')

(মানের 'অলিম্পিয়া')

সেই আদর্শ রূপটি ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু পতিতাদের রুঢ় বাস্তবতাবাদ ছাড়া সেটি প্রতিস্থাপিত করতে পারে এমন খুব জিনিসই আছে। যারা বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের আভঁ গার্ড শিল্পীদের (তুলুজ-লত্রেক, পিকাসো, রুওল্ট, জার্মান অভিব্যক্তিবাদ ইত্যাদি) চিত্রকর্মে অপরিহার্য নারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অ্যাকাডেমিক চিত্রকর্মে অবশ্য সেই সনাতন প্রথা এখনো অব্যাহত আছে।

ঐতিহ্যবাহী সনাতন ধারায় তথ্যপুষ্ট সেই দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধগুলো আজ প্রকাশের জন্য আরো ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ভিন্ন একটি মাধ্যম বেছে নিয়েছে - বিজ্ঞাপন প্রচারণা, সাংবাদিকতা, টেলিভিশন।

কিন্তু নারীকে দেখবার সেই মূল প্রক্রিয়া, মূল ব্যবহারগুলো, যেভাবে এখনো তাদের চিত্রগুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে, সেটি পরিবর্তিত হয়নি। পুরুষদের তুলনায় নারীদের উপস্থাপন করা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্নরুপে, এর কারণ কিন্তু নারীত্ব আর পৌরুষত্বের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে তা নয়, বরং এর কারণ হচ্ছে একজন আদর্শ দর্শক হিসেবে পুরুষকে সবসময়ই ধারণা করে নেয়া হয়েছে এবং পুরুষকেই খুশী করতে নারীর চিত্র সেভাবে পরিকল্পনা করে উপস্থাপন করা করা হয়েছে।

যদি এই বিষয়ে আপনার কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে নীচের এই পরীক্ষাটি করে দেখতে পারেন। এই বইটি থেকে প্রচলিত প্রথায় আঁকা নগ্ন নারীর যে-কোনো একটি চিত্রকর্ম বেছে নিন, তারপর চিত্রকর্মটির সেই নারীটিকে প্রতিস্থাপিত করুন একটি পুরুষের চিত্র দিয়ে, কাজটি আপনি মনশ্চক্ষু দিয়ে কল্পনা করে কিংবা এর কোনো পুনর্মুদ্রিত অনুলিপির উপর নিজেই একটি রেখাচিত্র এঁকে দেখার মাধ্যমে করতে পারেন। এরপর ভালোভাবে লক্ষ করুন, এই রূপান্তরটি কত বেশি ভয়ঙ্কর হিংস্রতার সাথে আচরণ করে। না চিত্রটির প্রতি নয়, বরং একজন সম্ভাব্য দর্শকের সেই দৃশ্য সম্বন্ধে পূর্বধারণাগুলোর প্রতি।

চতুর্থ অধ্যায়

সিমাবু এবং পেদ্রো দেলা ফ্রানচেস্কা

ফ্রা ফিলিপ্পো লিপি এবং জেরার্ড ডেভিড

র‍্যাফায়েল এবং মুরিলো

ফোর্ড ম্যাডক্স ব্রাউন

জটো-১২৬৬/৬৭-১৩৩৭

পিটার ব্রুয়েগেল ১৫২৫-১৫৬৯

জেরিকো ও হান্স বালদুং গ্রিয়েন

এদুয়ার্দ মানে

দাফনিস অ্যান্ড ক্লোয়ি - ১৫শ শতাব্দী

ভিনাস অ্যান্ড মার্স ১৫শ শতাব্দী

রুগিয়েরো, এঞ্জেলিকা সেইভড - ১৯শ শতাব্দী

এ রোমান ফিস্ট, ১৯শ শতাব্দী

প্যান অ্যান্ড সাইরিংস – অষ্টাদশ শতাব্দী

লাভ সিডিউসিং ইনোসেন্স, প্লেজার লিডিং হার অন, রেমরোজ ফলোয়িং

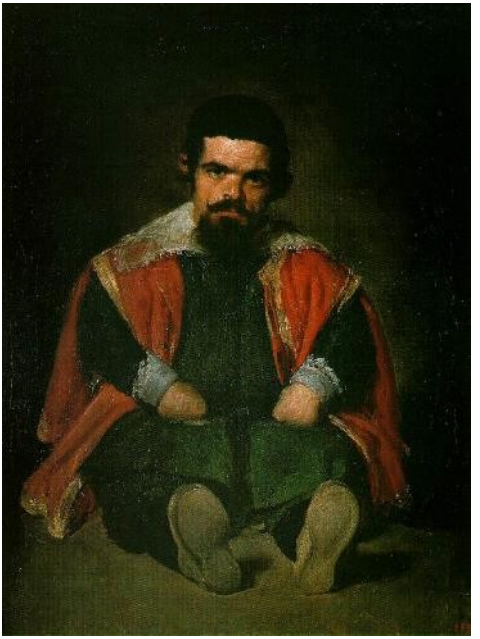

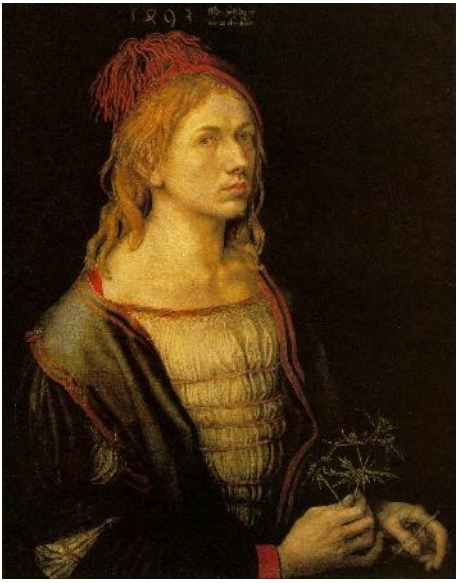

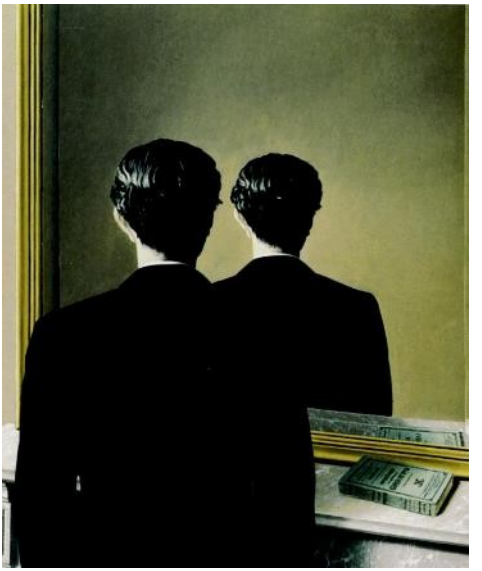

পঞ্চম অধ্যায়

তৈলচিত্র প্রায়ই নানা বস্তু বা দ্রব্যকে চিত্রায়িত করে। এমন সব দ্রব্য, বাস্তবিকভাবেই যা ক্রয়যোগ্য পণ্য। কিন্তু কোনো দ্রব্যকে ক্যানভাসের উপর চিত্রায়িত করবার কাজটির সাথে সেই দ্রব্যটি ক্রয় করা. এবং সেটি নিজের বাসায় সাজিয়ে রাখার মধ্যে তেমন বড় কোনো পার্থক্য নেই। আপনি যদি কোনো তৈলচিত্র ক্রয় করেন, তবে সেই চিত্রে অঙ্কিত বস্তু যা সেই দ্রব্যটির প্রতিনিধিত্ব করছে, তার সেই বাহ্যিক রূপটিও আপনি ক্রয় করছেন।

(প্যাস্টন ট্রেজারস অ্যাট অক্সনিড হল, ডাচ স্কুল)

কোনো কিছুর 'স্বত্বাধিকারী' হওয়া এবং দেখার প্রক্রিয়া যা কোনো তৈলচিত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে সেই বিষয়টিকে সাধারণত শিল্পবোদ্ধা এবং ইতিহাসবিদরা উপেক্ষা করে থাকেন। যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে, একজন নৃতাত্ত্বিক এই বিষয়টি বোঝার ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা সফল হয়েছিলেন।

লেভি-স্ট্রস লিখেছিলেন:

কোনো মালিক কিংবা এমনকি দর্শকের স্বার্থে কোনো একটি বস্তুকে নিজের দখলে পাবার এই তীব্র আর উচ্চাভিলাষী কামনা, আমি মনে করি পশ্চিমা সভ্যতার শিল্পকলার একটি লক্ষণীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলেছে।

যদি এটি সত্যি হয় - যদিও লেভি-স্ট্রসের এই সাধারণীকরণের ঐতিহাসিক ব্যাপ্তি অনেক বিশাল হতে পারে, তবে এই প্রবণতা এর শীর্ষবিন্দু ছুঁয়েছিল ঐতিহ্যবাহী প্রথাগত ধারায় করা তৈলচিত্র পর্বে।

'তৈলচিত্র' শব্দটি কোনো প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি শিল্পকলার একটি বিশেষ ফর্ম বা রূপকে সংজ্ঞায়িত করে। তেলের সাথে রঙের গুড়া মেশানোর প্রচলন ছিল সেই প্রাচীনকাল থেকে। কিন্তু শিল্পকলার একটি বিশেষ রূপের প্রকাশ হিসেবে এটি জন্ম নেয়নি যতদিন না জীবন সংশ্লিষ্ট একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার লক্ষ্যে এই প্রক্রিয়াটির আরো উন্নয়ন, নিঁখুত ও পরিশীলনের প্রয়োজন হয়েছে (যার পরিণতিতে খুব দ্রুত কাঠের প্যানেল বা পাতের পরিবর্তে ক্যানভাসের প্রচলন শুরু হয়েছিল)। যে কাজটি করতে টেম্পেরা কিংবা ফ্রেসকো উপযোগী প্রমাণিত হয়নি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে উত্তর ইউরোপে যখন প্রথম তৈলচিত্রের ব্যবহার শুরু হয়েছিল একটি নতুন চরিত্রকে চিত্রায়িত করবার জন্য, যে চরিত্রটি কিছুটা অবদমিত হয়েছিল মধ্যযুগীয় নানা শিল্পকলার প্রচলিত ধারাগুলোর উপস্থিতির কারণে। ষোড়শ শতাব্দীর আগ অবধি তৈলচিত্র তার নিজের স্বাভাবিক প্রকাশ, কোনো কিছু দেখার জন্য তার নিজস্ব পদ্ধতিগুলো পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।

আবার ঠিক কখন তৈলচিত্রের পর্বটি শেষ হয়েছে সেটিও কেউ বলতে পারবেন না। আজও তৈলচিত্র আঁকা হচ্ছে। তবে কোনো কিছু প্রদর্শন করবার তার চিরাচরিত পদ্ধতিটিকে দুর্বল করে দিয়েছিল ইমপ্রেশনিজম এবং পুরোপুরি পরাস্ত করে দিয়েছিলো কিউবিজম। প্রায় ঠিক এই সময়ে আলোকচিত্র দখল করে নেয় দৃশ্যমান কোনো চিত্রের উৎস হিসেবে তৈলচিত্রের মূখ্য অবস্থানটিকে। আর এই কারণে প্রথাগত ধারার তৈলচিত্রের সময়কাল ধরা যেতে পারে মোটামুটি ১৫০০ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত।

তবে প্রথা এখনো আমাদের বহু সাংস্কৃতিক পূর্বধারণার ভিত্তি রচনা করে থাকে। কোনো ছবির ন্যায় সদৃশ্যতা বলতে আমরা কী বুঝি, এটি সেই ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করে। এর অন্তর্গত নিয়মনীতিগুলো এখনো বেশ কিছু বিষয়কে আমরা কীভাবে দেখি সেই বিষয়টি প্রভাবিত করে, যেমন, ভূদৃশ্য, নারী, খাদ্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, পুরাণ কাহিনী। এটি শৈল্পিক প্রতিভা সংক্রান্ত আদর্শ রূপটির ধারণা আমাদের সরবরাহ করে এবং চিরাচরিত প্রথার ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণত যেভাবে ভাবা হয়, আমাদের শিক্ষা দেয়, শিল্পকলা সমৃদ্ধ হয় যদি কোনো সমাজের যথেষ্ট পরিমান সদস্য শিল্পকলাকে ভালোবাসেন।

শিল্পকলার প্রতি ভালোবাসা আসলে কী?

আসুন এই প্রচলিত ধারার একটি তৈলচিত্র নিয়ে আলোচনা করি, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে একজন শিল্পকলাপ্রেমী।

(টেনিয়েরের আর্চডিউক লিওপোল্ড ভিলহেম ইন হিজ প্রাইভেট পিকচার গ্যালারি)

কী দেখছি আমরা এখানে?

সেই ধরনের কোনো মানুষ, যার জন্য সপ্তদশ শতকের শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতেন।

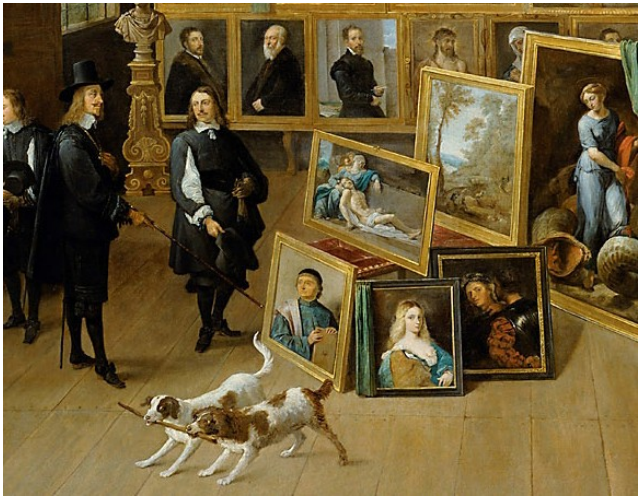

এইসব চিত্রকর্মগুলো আসলে কী?

অন্য যে-কোনো কিছু হবার আগেই, প্রথমত এরা নিজেরাই দ্রব্য, যাদের ক্রয় করা যায় ও যাদের উপর নিজের স্বত্ত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। ব্যতিক্রমী অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কোনো দ্রব্য। কোনো একজন পৃষ্ঠপোষক তার অধিকৃত শিল্পকর্ম দ্বারা যেভাবে নিজেকে পরিবেষ্টিত করে রাখতে পারেন, সেভাবে সঙ্গীত কিংবা কবিতা তাদের পৃষ্ঠপোষককে পরিবেষ্টিত করে রাখতে পারে না।

চিত্রটি দেখলে মনে হয় যেন কোনো সংগ্রহকারী, তিনি এমন একটি ভবনে বাস করেন, তা চিত্রকর্ম দিয়ে নির্মিত হয়েছে। পাথর কিংবা কাঠের তৈরি দেয়ালের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কী সুবিধা আছে তাদের?

এরা (এইসব চিত্রকর্ম) এর পৃষ্ঠপোষককে নানা ধরনের দৃশ্য প্রদর্শন করে, সেই সব দ্রব্যের দৃশ্য, যাদের মালিক হয়তো তিনি।

আবারো লেভি-স্ট্রসের মন্তব্য করেছিলেন, কীভাবে একটি চিত্রকর্মের সংগ্রহশালা সংগ্রাহকের অহংকার, এবং আত্মপ্রেম নিশ্চিত করতে পারে:

> রেনেসাঁর শিল্পীদের জন্য হয়তো চিত্রকলা ছিলো জ্ঞান আহরণ করার একটি উপকরণ, কিন্তু এছাড়াও এটি ছিল কোনো কিছু উপর স্বত্ত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করার একটি উপকরণ, আর যখন আমরা রেনেঁসা সময়কালীন চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা করবো আমরা অবশ্যই যেন ভুলে না যাই, এটি কেবল সম্ভব হয়েছিল কারণ বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছিল ফ্লোরেন্স এবং অন্যান্য স্থানে, আর সেইসব ইটালিয় বণিকরা চিত্রকরদের তাদের প্রতিনিধি হিসেবে দেখতেন, যারা তাদের আশ্বস্ত করতে পারে, তাদের অধিকৃত যা কিছু আছে, সেই সবকিছুই আসলে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর আর আরাধ্য দ্রব্য। তৈলচিত্রগুলোর মালিকরা, পৃথিবীর যা কিছুর প্রতি তারা অনুরক্ত ছিল এবং যা কিছু তারা নিজের হাতের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসতে চাইত, শিল্পীদের কল্যাণে তা এমন বাস্তবসম্মতভাবে পুনঃসৃষ্টি করা হয়েছিলো যে, ফ্লোরেন্টাইন প্রাসাদের তৈলচিত্রগুলো আসলেই তাদের অনুজগতের প্রতিনিধিত্ব করতো।

যে-কোনো পর্বের শিল্পকলা সমসাময়িক শাসকগোষ্ঠীর আদর্শগত ধ্যানধারণার বাহক হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করার প্রবণতা প্রদর্শন করে। আমরা যদি খুব সরলভাবে বলি, ১৫০০ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপীয় শিল্পকলা, ধারাবাহিকভাবে সফল শাসকশ্রেণিদের স্বার্থ রক্ষা করেছে, যাদের সবাই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে পুঁজিবাদের নতুন ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল ছিল, তাহলে আমরা আসলে খুব নতুন কিছু বলছি না। যা প্রস্তাব করা হচ্ছে তা খানিকটা বেশি নির্দিষ্ট; সেটি হচ্ছে, সম্পদ ও বিনিময়ের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল পৃথিবীকে দেখার এই পদ্ধতি মূলত তৈলচিত্রে এর দৃশ্যগত অভিব্যক্তি খুঁজে পেয়েছিল, যেমন করে আর কোনো ধরনের দৃশ্যমান মাধ্যমে সেটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

পানিনির ‘পিকচার গ্যালারি অব কার্ডিনাল ভ্যালেনটি গনসাগা’

কোনো দৃষ্টিগোচর উপস্থিতি বা দৃশ্যরূপের সাথে তৈলচিত্র যা করেছিল, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুঁজি ঠিক সেটি করেছে। এটি সবকিছুকে দ্রব্যের সমান পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসে। সবকিছুই বিনিময়যোগ্য দ্রব্য হিসেবে রূপান্তরিত হয়, কারণ সবকিছু সেখানে ভোগ্যবস্তুতে রূপান্তরিত হয় । সব বাস্তবতা যান্ত্রিকভাবে পরিমিত হয় এর দ্রব্যগুণের বস্তুবাদীতার উপর। আর আত্মা, কার্তেসিয় পদ্ধতির কল্যাণে সুরক্ষিত হয় ভিন্ন একটি শ্রেণিতে, পৃথকভাবে। একটি চিত্রকর্ম আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে ঠিকই - তবে চিত্রকর্মটি যে বিষয়বস্তুর কথা বলছে শুধুমাত্র সেই উপায়ে, কিন্তু এটি তার অন্তরে কী ভাবছে কখনোই সেই উপায়ে নয়। তৈলচিত্র সম্পূর্ণ বহির্মুখী একটি দৃশ্যকে প্রকাশ করে থাকে।

এই ধারণার বিরোধী চিত্রকর্মগুলো যা প্রায় তাৎক্ষণিক ভাবেই আমাদের মনের ভিতর ভেসে ওঠে, যেমন রেমব্রান্ট, এল গ্রেকো, জিওর্জিওনে, ভার্মিয়ের, টার্নার প্রমুখ শিল্পীর সৃষ্টি। কিন্তু কেউ যদি এইসব চিত্রকর্ম পুরো প্রচলিত ধারার চিত্রকর্মগুলোর পাশাপাশি রেখে বিবেচনা করেন, তারা লক্ষ করতে পারবেন যে, এই চিত্রকর্মগুলো আসলে খুবই বিশেষ ধরনের ব্যতিক্রমী কিছু কাজ।

ঐতিহ্যবাহী প্রথায় আঁকা তৈলচিত্রের মধ্যে আছে সারা ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শত হাজার ক্যানভাস আর ইজেলে আঁকা চিত্রকর্ম। এছাড়া বিশাল সংখ্যক কাজের এখন আর কোনো অস্তিত্ব নেই। যা টিকে গেছে তার খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ গুরুত্বের সাথে বর্তমানে চিত্রকলার নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়, এবং এই ক্ষুদ্র অংশটির আরেকটি ক্ষুদ্র অংশে আছে সত্যিকারের চিত্রকর্মগুলো, যেগুলো বার বার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এবং যাদের উপস্থাপন করা হয়, ‘মাষ্টার’ শিল্পীদের কাজ হিসেবে।

(ইনটেরিওর অব এন আর্ট গ্যালারি, ফ্লেমিশ, ১৭শ শতাব্দী)

শিল্পকলার মিউজিয়ামের দর্শকরা, সেখানে প্রদর্শিত শিল্পকর্মের সংখ্যা দেখে প্রায়ই অভিভূত হয়ে পড়েন এবং তারা এই সব অসংখ্য কাজের খুব সামান্য অংশেই যে মনোযোগ দিতে পারবেন, এই ভাবনাটি নিজেদের অপরাধযোগ্য অক্ষমতা হিসেবে মনে করে থাকেন অনেকে, এবং আসলেই এধরনের একটা অনুভূতি যুক্তিযুক্ত। শিল্পকলার ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে, ইউরোপীয় ঐতিহ্যে অসাধারণ কোনো শিল্পকর্ম এবং গড়পড়তা কোনো শিল্পকর্মের মধ্যকার সম্পর্কটির সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করতে। প্রতিভাবান, কোনো প্রত্যুত্তর হিসেবে এই ধারণাটি এককভাবে কিন্তু যথেষ্ট না। পরিণতিতে সংশয়বোধ গ্যালারির দেয়ালে টিকে থাকে। কোনো স্বীকৃতি ছাড়াই অসাধারণ কোনো চিত্রকর্মকে পরিবেষ্টন করে রাখে নিম্নমানের বহু চিত্রকর্ম - এই দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো যে কী, তার ব্যাখ্যা দেয়া তো দূরের কথা।

যে-কোনো সংস্কৃতির শিল্পকলা নানা মাপের প্রতিভার বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে। কিন্তু তৈলচিত্রের ক্ষেত্রে যেমনটা আমরা দেখি, তেমনি আর কোনো সংস্কৃতিতেই একটি মাষ্টারপিস আর একটি গড়পড়তা মানের কোনো চিত্রকর্মের মধ্যে পার্থক্য এতো বিশাল হিসেবে বিবেচিত হয় না। এই প্রচলিত ধারায় এই পার্থক্যের উৎস শুধু দক্ষতা বা কল্পনাশক্তিই নয়, এখানে মনোবলেরও ব্যপার আছে। গড়পড়তা কোনো কাজ হচ্ছে - সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে যা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে - সেই সব কাজগুলো, যা কমবেশি নৈরাশ্যবাদী মানসিকতা নিয়েই তৈরি করা হয়েছে: অর্থাৎ যে মূল্য এটি নামমাত্রে প্রকাশ করছে, শিল্পীর কাছে সেটি কমিশন শেষ করা কিংবা তার কাজ বিক্রি করার চেয়ে অপেক্ষকৃত কম অর্থবহ। এইসব সাধারণ মানের ভাড়াটে কাজগুলো কিন্তু শিল্পীর অদক্ষতা বা তার চিন্তার পশ্চাদপরণশীল আঞ্চলিকতার ইঙ্গিত দেয় না বরং এটি শিল্পকর্মের উপর বাজারের ক্রমবর্ধিষ্ণু চাপের ফলাফল। তৈলচিত্র পর্বটি, চিত্রকলার

উন্মুক্ত বাজারের উত্থানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। শিল্পকর্মের বাজার আর শিল্পকর্মের পারস্পারিক এই স্ববিরোধিতার মধ্যেই, অসাধারণ আর গড়পড়তার কোনো চিত্রকর্মের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর বিভেদ, যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তার ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে।

ব্যতিক্রমী অসাধারণ চিত্রকর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে, সে বিষয়ে আবার আমরা আলোচনায় ফিরে আসবো, তবে এবার আসুন প্রথমে বিস্তারিতভাবে দেখার চেষ্টা করি, প্রথাগত ঐতিহ্যবাহী ধারা সম্বন্ধে।

শিল্পকলার অনান্য শাখা থেকে তৈলচিত্রকে খুব সহজেই আলাদা করা যায় যে বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে, সেগুলো হচ্ছে, এটির স্পর্শযোগ্য বোধগম্যতা; এর বুনট, এর উজ্জ্বলতা, এবং ঘনত্ব ইত্যাদি গুণাবলী আরোপ করবার বিশেষ দক্ষতা। এটি যা বাস্তব তাকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করে, যেন আপনি তা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারবেন।

যদিও তৈলচিত্রের আঁকা সেই চিত্রকর্মটি দ্বিমাত্রিক, কিন্তু কোনো ভাস্কর্যের চেয়ে ত্রিমাত্রিকতার বিভ্রম সৃষ্টি করবার ক্ষমতা এদের অনেক বেশি, কারণ এটি অঙ্কিত বস্তুটির রং, বুনট, তাপমাত্রা ও শূন্যস্থান পুরণ করা এবং সেই অর্থে পুরো বিশ্বকে পূর্ণ করার ধারণা সৃষ্টি করতে পারে।

হলবাইনের আঁকা তৈলচিত্র, ‘দি অ্যাম্বাসেডরস’ এই ধারার সূচনা লগ্নে দাড়িয়ে আছে, এবং নতুন একটি পর্বের সূচনায়, কোনো চিত্রকর্মের সাথে সাধারণত যা হয়ে থাকে , এর বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট, নিষ্কপট। যেভাবে এটি আঁকা হয়েছে সেটি প্রদর্শন করছে এর বিষয়বস্তুটি কি। কীভাবে এটি আঁকা হয়েছে?

হলবাইনের দি অ্যাম্বাসেডরস

অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এটি আঁকা হয়েছে যেন এটি দর্শকের মনে একটি বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারে, যেন তিনি সত্যিকারের কোনো বস্তু আর দ্রব্যের দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রথম নিবন্ধে বিষয়টি স্পষ্ট করেছিলাম যে, স্পর্শানুভূতির বোধটি অনেকটা সীমাবদ্ধ স্থবির দৃষ্টিশক্তির মত। এই তৈলচিত্রের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা, বিশুদ্ধভাবে তার দর্শনযোগ্যতা বজায় রেখে দর্শকের স্পর্শ করবার অনুভূতির প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। আমাদের দৃষ্টি পশমী কাপড় থেকে রেশমী কাপড়, সেখান থেকে ধাতব কোনো কিছু, সেখান থেকে কাঠ, আবার মখমল থেকে মার্বেল, সেখান থেকে কাগজ, তারপর আবার পশমী নরম ফেল্টে, এবং প্রতিবারই চোখ যা দেখে সেই তৈলচিত্রে, স্পর্শানুভূতির ভাষায় ইতিমধ্যেই তা অনুদিত হয়ে যায়। ছবিতে দুটি মানুষের উপস্থিতি ও তাদের দেহভঙ্গিমায় কিছু বিশেষত্ব আছে এবং সেই সাথে আছে অনেক দ্রব্য, যা নানা ধারণারই প্রতীকিরূপ। কিন্তু এখানে অঙ্কিত নানা দ্রব্য, জিনিসপত্র, যা সব কিছু এই মানুষ দুটিকে পরিবেষ্টিত করে আছে এবং তাদের আচ্ছাদিত করেছে পরিচ্ছদে, সেই বিষয়গুলো এই তৈলচিত্রটিতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

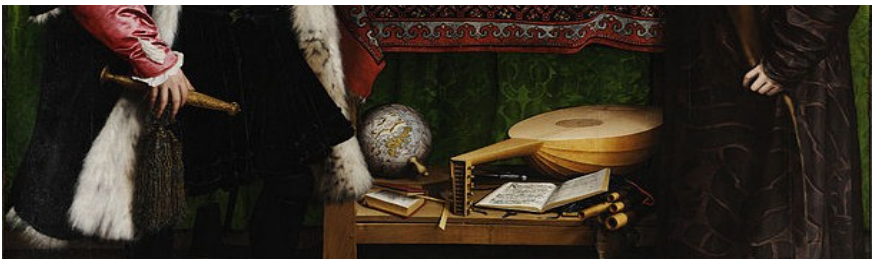

মুখাবয়ব ও হাতগুলো ছাড়া এই তৈলচিত্রের এমন কোনো জায়গা নেই, যা কাউকে সচেতন করে তুলতে কখনো ব্যর্থ হয় না, কত সূক্ষ্ম আর বিস্তারিতভাবে সেগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে - তাঁত শিল্পী, কাপড়ে নকশা বুননকারী, গালিচা নির্মাতা, স্বর্ণকার, চামড়া নির্মাতা , মোজাইক শিল্পী, পশমের কাপড় নির্মাতা, দর্জি, অলংকার নির্মাতাদের দ্বারা - এবং কীভাবে হলবাইন শিল্পী হিসেবে, সেই সব দ্রব্যগুলোর প্রতিটির পৃষ্টদেশের সমৃদ্ধতাকে পুনঃসৃষ্টি করবার মাধ্যমে অবশেষে আরো বেশি অলংকৃত করেছেন।

এই গুরুত্ব আরোপণ করার প্রক্রিয়া এবং যে পরিমান দক্ষতা সেই কাজটি করবার নেপথ্যে আছে সেটি তৈলচিত্রের প্রথাগত ধারাটির একটি চিরন্তন বৈশিষ্ট্য হিসেবে অপরিবর্তিত ছিলো ।

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ধারায় বানানো শিল্পকর্মগুলো ইতিপূর্বে ধনসম্পত্তির গুণকীর্তন করতো, কিন্তু সম্পদ সেই সময় ছিল সুনির্দিষ্ট সামাজিক কিংবা স্বর্গীয় শ্রেণিবিন্যাসের প্রতীক। তৈলচিত্র একটি নতুন ধরনের সম্পদের গুণকীর্তন শুরু করেছিল - যে সম্পদ গতিময় এবং যা এর একমাত্র অনুমোদন খুঁজে পায় অর্থের সর্বোচ্চ ক্রয়ক্ষমতার উপর। এভাবে তৈলচিত্রটি নিজেই সক্ষম হয় প্রদর্শন করতে, অর্থ কী ক্রয় করতে পারে সেই আকাঙ্ক্ষাকে। এই ক্রয় করবার আকাঙ্ক্ষা নিহিত থাকে এর

স্পর্শযোগ্যতার গভীরে, কীভাবে স্বত্বাধিকারী চিত্রিত বস্তুকে স্পর্শ করে আনন্দ লাভ করতে পারবেন তার উপরেও।

হলবাইনের তৈলচিত্র - 'দি অ্যাম্বাসেডরস' এর সামনের ক্ষেত্রটিতে একটি ডিম্বাকৃতির অস্পষ্ট আর রহস্যময় বস্তুর দেখা মেলে, এটি অতিমাত্রায় বিকৃত আকারের একটি মাথার খুলি : এমন একটি খুলি যা হয়তো কোনো বিকৃত আয়নায় দেখতে পাওয়া সম্ভব। এটি কীভাবে আঁকা হয়েছিল এবং কেনই বা এই দুই রাষ্ট্রদূত মাথার খুলিটাকে সেখানে রাখতে চেয়েছিলেন সেটা নিয়ে বেশ কিছু তত্ত্ব আছে। কিন্তু সবাই অন্তত একটি ব্যাপারে একমত যে, খুলিটি আসলে মানুষ মরণশীল সেই সত্যটির স্মারক বা 'মেমেন্টো মরি' মধ্যযুগীয় একটি ধারণা নিয়ে খানিকটা নাটকীয় অনুশীলন, যে ধারণায় একটি মাথার খুলির প্রতীকি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, মৃত্যুর সার্বক্ষণিক উপস্থিতিকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু আমাদের যুক্তির জন্য যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো মাথার খুলিটি আঁকা হয়েছে বাকি সবকিছু থেকে ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ (আক্ষরিকার্থে) ব্যবহার করে। যদি মাথার খুলিটি তৈলচিত্রের বাকি সব উপাদানের মতো করে স্বাভাবিক ধারায় আঁকা হতো, তবে তার অধিবিদ্যামূলক নিহিতার্থ সেখান থেকে হারিয়ে যেত। বাকি সবকিছুর মতোই এটিও একটি বস্তুতে পরিণত হত, যা শুধুই কোনো মৃত মানুষের কংকালের একটি অংশ মাত্র।

(দে পুর্টারের ভ্যানিটি)

এই ধারার পুরো পর্বে এটাই ছিল স্থায়ী একটি সমস্যা; যখন অধিবিদ্যামূলক রূপক প্রতীক চিত্রগুলো ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল (এবং পরবর্তীতে কিছু শিল্পীও সত্যিকারের মাথার খুলি আঁকতেন সুস্পষ্টভাবে মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে দেখানোর জন্য)। কিন্তু তৈলচিত্র আঁকার পদ্ধতির সুস্পষ্ট, স্থবির বস্তুবাদীতা তাদের ব্যবহৃত এই প্রতিকীবাদকে সাধারণত অবিশ্বাস্য অথবা অপ্রাকৃতিক হিসেবে উপস্থাপিত করতো।

সেই একই স্ববিরোধিতার কারণে প্রচলিত ধারায় কোনো গড়পড়তা ধর্মীয় চিত্রকর্মকে দেখলে মনে হয় ভণ্ডামিপূর্ণ। চিত্রকর্মের মূল ভাবনার দাবি সারশূন্য হয়ে যায় যেভাবে এর বিষয়বস্তুটিকে আঁকা হয়। চিত্রকর্মের জমিনের রং কিছুতেই স্পর্শযোগ্য কোনো কিছু আহরণ করবার মূল প্রবণতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না, যা এর মালিককে স্পর্শযোগ্য তাৎক্ষণিক কোনো তৃপ্তি দিতে পারে। যেমন, এখানে মেরি ম্যাগডালেনকে নিয়ে আঁকা তিনটি তৈলচিত্র।

(অ্যামব্রোসিয়াস বেনসন, দ্য ম্যাগডালেন রিডিং, ওয়ার্ফের মেরি ম্যাগডালেন, বড্রির দ্য পেনিটেন্ট ম্যাগডালেন)

তাঁর গল্পের মূল বিষয়টি হলো, তিনি যীশুখ্রিস্টকে এতটাই ভালোবেসেছিলেন যে, তাঁর অতীতের জন্য তিনি অনুশোচনা করেছিলেন এবং অবশেষে রক্তমাংসের এই শরীরের মরণশীলতা এবং আত্মার অমরত্বকে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। তা সত্ত্বেও যেভাবে এই তৈলচিত্রগুলো আঁকা হয়েছে সেটি এই গল্পটির মূল সুর বিরোধী। যেন মনে হবে, অনুশোচনার মাধ্যমে তাঁর জীবনের কোনো রূপান্তর সেখানে ঘটেনি। তৈলচিত্র আঁকার পদ্ধতিটির কোনো ক্ষমতা নেই মেরি ম্যাগডালেন তাঁর জীবনে অনুশোচনা পরবর্তী যে আত্মত্যাগ করেছিলেন সেটি সৃষ্টি করবার। বরং তাঁকে একটি জীবিত মানবসত্তা হিসেবে আঁকা হয়েছে এবং কোনো কিছু হবার আগে, মেরি একজন কামনাযোগ্য নারী, যা কে পাওয়া যেতে পারে। তৈলচিত্র-আঁকার-পদ্ধতির মোহাবিষ্ট করবার ক্ষমতার কাছে তিনি এখনো নমনীয় একটি বিষয়বস্তু।

(উইলিয়াম ব্লেক - ডিভাইন কমেডির অলংকরণ)

এখানে উইলিয়াম ব্লেকের কৌতূহলোদ্দীপক ব্যতিক্রমী ঘটনাটি আলোচনা করা যেতে পারে। ড্রাফটসম্যান এবং এনগ্রেভার হিসেবে ব্লেক প্রথাগত ধারার মধ্যে থেকেই কাজ শিখেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি চিত্রাঙ্কন করতে শুরু করেছিলেন, কদাচিৎ তিনি তেল রং ব্যবহার করেছিলেন এবং যদিও তিনি মূলত প্রথাগত ধারার রেখাচিত্র পদ্ধতির উপর নির্ভর করেই সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর চিত্রকর্মগুলো, কিন্তু তিনি, তার পক্ষে যা করা সম্ভব সবই করেছিলেন, তার আকা শরীরগুলোকে এর গঠনগত উপাদানগুলো থেকে মুক্তি দিতে, শরীরগুলো সেই উপাদানগুলো হারিয়ে তার সৃষ্টিতে রূপ নেয় স্বচ্ছ, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব কোনো একটি সত্তা হিসেবে, যারা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে উপেক্ষা করে , যাদের উপস্থিতি দৃষ্টিগোচর তবে স্পর্শযোগ্য নয়, কোনো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব এমন কোনো পৃষ্ঠদেশ ছাড়াই তারা দ্যুতিময়, যারা কখনোই কোনো বস্তুতে রূপান্তরযোগ্য নয়।

তৈলচিত্রে অঙ্কিত কোনো বস্তুর এই বাস্তব প্রকৃত অস্তিত্ব সম্পন্ন উপস্থিতিটিকে অতিক্রম করবার জন্য ব্লেকের এই বাসনাটির উৎস প্রচলিত ধারার সীমাবদ্ধতা ও এর অর্থ সম্বন্ধে তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি।

আমরা আবার ফিরে আসি ‘দ্য টু অ্যামবাসেডরস’ তৈলচিত্রটিতে, পুরুষ হিসেবে সেখানে তাদের উপস্থিতির দিকে নজর দিতে। এর অর্থ হচ্ছে আমরা তৈলচিত্রটিকে ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করবো। এটি তার ফ্রেমের মধ্যে কী প্রদর্শন করছে সেই পর্যায়ে না, বরং এটি ফ্রেমের বাইরে কোন বিষয়কে ইঙ্গিত দিচ্ছে সেই পর্যায়ে।

(হলবাইনের দি অ্যাম্বাসেডরস)

এই দুই পুরুষকে আমরা দেখতে পাই আত্মবিশ্বাসী এবং তাদের ভঙ্গিমায় আনুষ্ঠানিক এবং তাদের মধ্যে স্পষ্টত স্বাচ্ছন্দ্যময় একটি সম্পর্কের উপস্থিতির আভাস পাই আমরা। কিন্তু তারা কীভাবে তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে কিংবা শিল্পীর দিকে? তাদের দৃষ্টি ও দাড়িয়ে থাকার ভঙ্গিমায় বেশ কৌতূহলোদ্দীপকভাবে কোনো ধরনের স্বীকৃতি পাবার প্রত্যাশা অনুপস্থিত। যেন নীতিগতভাবে তাদের যোগ্যতা আর মূল্যকে অন্য কারো পক্ষেই শনাক্ত করা সম্ভব নয়। তারা এমনভাবে কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে আছেন যেন, তারা এর অংশ নয় অথবা এমন কিছুর দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ, যা তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে আছে এবং এই পরিবেষ্টনী থেকে তাঁরা নিজেদের পৃথক করে রাখতে চাইছেন। সবচেয়ে উত্তম কোনো পরিস্থিতিতে, হয়তো সেই পরিবেষ্টনী তৈরি করতে পারে তাদের প্রতি সন্মান জানাতে আসা সাধারণ মানুষের কোনো একটি দল, আর সবচেয়ে খারাপ কোনো পরিস্থিতিতে, হতে পারে, অনুপ্রবেশকারী একদল দুর্বৃত্ত।

এই ধরনের মানুষদের সাথে বাকি পৃথিবীর সম্পর্ক কেমন ছিল?

তৈলচিত্রটিতে প্রদর্শিত টেবিলের বিভিন্ন তাকের উপর সজ্জিত উপাদানগুলোর উদ্দেশ্য, অল্প কিছু মানুষ যারা এই বস্তুগুলো কী বোঝাতে চাইছে সেই ইঙ্গিতটি পড়তে সক্ষম, এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান সংক্রান্ত কিছু নির্দিষ্ট পরিমান তথ্য সরবরাহ করা। চার শতাব্দী পর আমরা আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই তথ্যগুলো মূল্যায়ন করতে পারি।

উপরের তাকে সাজানো বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামগুলো দিকনির্দেশনা সংক্রান্ত যন্ত্র। এটি ছিল সেই সময়, যখন সমুদ্রের নানা বাণিজ্যপথগুলো একের পর এক উন্মুক্ত হচ্ছিল , মূলত দাস বাণিজ্যেকে সহায়তা ও যাতায়াত সহজ করবার লক্ষ্যে। যা অন্য মহাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ মুনাফা শুষে নিয়ে এসেছিল এবং পরবর্তীতে যা শিল্পবিপ্লবের সূচনা তরান্বিত করেছিল।

১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা পঞ্চম চার্লসের পৃষ্ঠপোষকতায় ম্যাজেলান বিশ্বব্যাপী সমুদ্রযাত্রা শুরু করেছিলেন, তিনি ও তার একজন জ্যোতির্বিদ বন্ধু, একত্রে যারা এই অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন - তারা স্পেনের রাজদরবারের সাথে সমঝোতা করে নিয়েছিলেন যে, এই অভিযানের লভ্যাংশের শতকরা বিশ ভাগ পাবেন তারা দুজন এবং তারা যে দেশ জয় করবেন, সেই দেশ শাসন করবার অধিকারও তাদের থাকবে ।

নীচের তাকে রাখা একটি সমসাময়িক সময়ের প্রেক্ষিতে নতুন ভূগোলক, যেখানে লিপিবদ্ধ করা আছে ম্যাজেলানের এই সা¤প্রতিক সমুদ্রযাত্রাগুলো। হলবাইন এই ভূগোলকটির উপর ফরাসী একটি এস্টেটের নাম যুক্ত করেছেন, যার মালিক ছিলেন বাম দিকে দাড়ানো রাষ্ট্রদূতটি। ভূগোলেকের পাশে আমরা গণিতের বই, একটি প্রার্থনা সঙ্গীতের বই ও একটি ল্যুট (বাদ্যযন্ত্র) দেখতে পাই। কোনো দেশকে উপনিবেশে রূপান্তরিত করতে প্রয়োজন সেই দেশের জনগণকে খ্রিস্ট ধর্মে রূপান্তরিত করা এবং হিসাবরক্ষণ কৌশল প্রদর্শন করা এবং এভাবে তাদের কাছে প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হতো এর শিল্পকলাসহ ইউরোপীয় সভ্যতা পৃথিবীতে সবচেয়ে অগ্রসর।

(দে উইটের আঁকা এডমিরাল দ্য রুইটার ইন দ্য ক্যাসেল অব এলমিনা)

একজন আফ্রিকাবাসী নতজানু হয়ে তার মালিককের সামনে একটি তৈলচিত্র ধরে আছে, উপরের এই তৈলচিত্রে সেখানে আমরা দেখতে পাই একটি দুর্গের ছবি, যেটি পশ্চিম আফ্রিকার ক্রীতদাস বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল।

ঠিক কতটা সরাসরি এই দুইজন রাষ্ট্রদূত প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের অভিযাত্রায় জড়িত ছিলেন সেই বিষয়টি নির্দিষ্টভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ আমাদের জন্য এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বাকি পৃথিবীর প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। আর বিষয়টি একটি পুরো শ্রেণির জন্য সাধারণীকরণ করা সম্ভব। সেই শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী এই দুই রাষ্ট্রদূত নিশ্চিৎ ও বদ্ধপরিকর যে, তাদের গৃহসজ্জা ও সম্পদ আহরণের জন্য সারা পৃথিবীতে সম্পদ ছড়িয়ে আছে। চরম একটি পর্যায়ে এই ধরনের দৃঢ় বিশ্বাসের উপস্থিতির নিশ্চিৎ প্রমাণ মেলে ঔপনিবেশিক শাসক ও তাদের অধ্যুষিত শোষিতদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কে।

কোনো বিজয়ী দখলকারী এবং অধ্যুষিত জনগণের মধ্যে এই সম্পর্কগুলোর প্রবণতা আছে স্বপ্রণোদিতভাবে এটিকে চিরন্তনভাবে টিকিয়ে রাখা। একজনের দৃষ্টিতে অন্যজনের উপস্থিতি তাদের নিজের সম্বন্ধে এই অমানবিক মূল্যায়নটি নিশ্চিত করে। এই সম্পর্কের আবদ্ধময় রূপটি আমরা দেখতে পাই নিচের রেখাচিত্রটিতে, এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাবোধে। যেভাবে একজন আরেকজনকে দেখে সেটি তার নিজের সম্বন্ধে তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকেই সত্যায়িত করে।

(ইন্ডিয়া অফারিং হার পার্লস টু ব্রিটানিয়া, ১৮শ শতাব্দী)

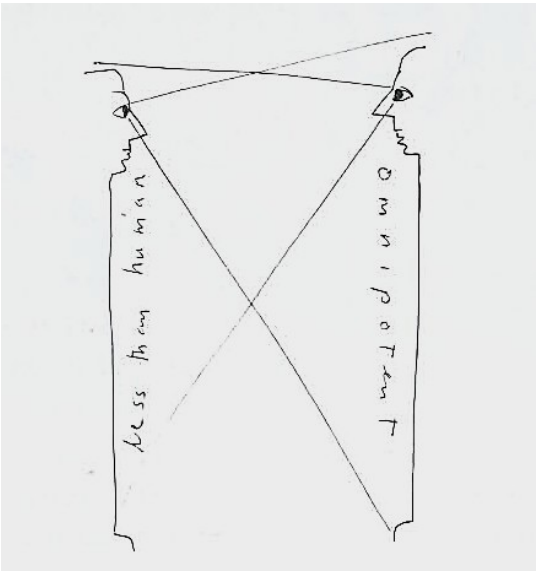

দুই রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি কিছুটা বিচ্ছিন্ন এবং ক্লান্ত, তারা এর কোনো প্রতিদান প্রত্যাশা করছেন না। তাদের কামনা দুইজনের এই ভঙ্গিমায় তাদের ব্যক্তিত্বের চিত্র, যেন অন্যদের সচেতনভাবে আকৃষ্ট করে, যেন তারা সতর্কতার সাথে তাদের দূরত্ব বজায় রাখবে। রাজা এবং সম্রাটদের উপস্থিতি তাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এরকমই অনুভূতি সৃষ্টি করেছে দর্শকদের মনে এর আগে। কিন্তু তাদের ছবি তুলনামূলকভাবে অনেক দূরবর্তী আর নৈর্ব্যক্তিক। এখানে যা নতুন এবং আমাদের বিভ্রান্ত করে তা হলো তাদের 'স্বাতন্ত্র্যসূচক উপস্থিতি', দর্শক এবং দৃশ্যের মধ্যে যে দূরত্ব আছে বিষয়টি প্রস্তাব করবার জন্য যার

প্রয়োজন আছে। অবশেষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ তর্কের খাতিরে মেনে নেয় সাম্যতাকে। কিন্তু তারপরও সাম্যতাকে অবশ্যই অবিশ্বাস্য কল্পনাতীত হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।

এই সংঘর্ষ আবারো আমরা আবির্ভূত হতে দেখি তৈলচিত্র অঙ্কনের পদ্ধতির মধ্যে। তৈলচিত্রের এই উপরি সত্য সদৃশ্যতার প্রবণতা আছে এর দর্শককের মনে চিন্তা উদ্রেক করার, তার মনে হবে এই চিত্রের সন্মুখভাগে যে সব উপদান অঙ্কিত হয়েছে সেই সব কিছুরই সে খুব নিকটে, স্পর্শের নাগালের মধ্যে দাড়িয়ে আছে। আর যদি এই বিষয়বস্তু হয় কোনো ব্যক্তি, তা হলে এই নৈকট্য নির্দিষ্ট বিশেষ কোনো অন্তরঙ্গতার ইঙ্গিত করে।

(সুটারম্যানস, ফার্দিনান্দ দ্য সেকেন্ড অব টুসকানি অ্যান্ড ভিত্তোরিয়া ডেলা রোভেরে)

তারপরও কোনো অঙ্কিত প্রতিকৃতিকে অবশ্যই খানিকটা আনুষ্ঠানিক দূরত্বের ব্যাপারটির বজায় রাখতে জোর করতে হয় এবং এই বিষয়টি - চিত্রকরের কোনো কৌশলগত অদক্ষতার কারণে নয়, প্রচলিত ধারার গড়পড়তা সব প্রতিকৃতিকে করে তোলে আড়ষ্ট এবং অনমনীয়। কোনো কিছু দেখা সংক্রান্ত এর নিজস্ব সংজ্ঞার গভীরেই কৃত্রিমতা থাকে, কারণ বিষয়বস্তুকে একই সাথে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কোনো অবস্থান থেকে দেখতে হবে।

এর তুলনা করা যেতে পারে কোনো একটি আণুবীক্ষণিক যন্ত্রের নীচে কোনো কিছু দেখার সাথে।

তারা তাদের সব বৈশিষ্ট্য নিয়েই অপেক্ষা করছে সেখানে এবং আমরাও তাদের নিরীক্ষা করে দেখতে পারি, কিন্তু আমাদেরকেও তারা সেই ভাবে নিরীক্ষা করছে এমন কল্পনা করা অসম্ভব।

(ডেভিসের মিস্টার অ্যান্ড মিসেস উইলিয়াম অ্যাথারটন)

আনুষ্ঠানিক প্রতিকৃতি, যা আত্মপ্রতিকৃতি বা চিত্রকরের নিজের বন্ধুর কোনো প্রতিকৃতি থেকে খুব ভিন্ন, এই বিষয়টি কখনোই সমাধান করতে পারেনি। কিন্তু যতই এই ধারা অগ্রসর হয়েছে, প্রতিকৃতির অঙ্কিত ব্যক্তিগুলোর অবয়বও ক্রমশ সাধারণত্বের বৈশিষ্ট্যহীনতায় রূপান্তরিত হয়েছে।

তার অবয়বের বিশেষায়িত বৈশিষ্ট্যগুলো রূপান্তরিত হয়েছে তার মুখোশে, যা তার পরিচ্ছদের সাথে মানানসই। আজ এই ক্রম উন্নয়নের শেষ পর্যায়টি গড়পড়তা রাজনীতিবিদদের পুতুলের মত টিভিতে আবির্ভূত হবার মধ্যে দেখা যেতে পারে।

এবার আসুন সংক্ষিপ্তভাবে তৈলচিত্রের কিছু ‘জনরা’ বা শ্রেণি নিয়ে আমরা আলোচনা করি, সেই শ্রেণিগুলো যা এর প্রথাগত ঐতিহ্যের অংশ এবং যার অস্তিত্ব আর কোনো কিছুর মধ্যে আমরা দেখি না।

তৈলচিত্রের ঐতিহ্য বা প্রথা শুরু হবার আগে মধ্যযুগীয় চিত্রকররা তাদের চিত্রে প্রায়ই সোনার পাতা ব্যবহার করতেন, এরপর চিত্রকর্ম থেকে স্বর্ণ ব্যবহার করবার সেই প্রথা উঠে গেলে সেটি শুধুমাত্র ছবির ফ্রেমে ব্যবহার করা হতো। যদিও অসংখ্য তৈলচিত্র নিজেরাই খুব সরলভাবে প্রদর্শন করে যে, স্বর্ণ বা অর্থ কী ক্রয় করতে সক্ষম। ক্রয়যোগ্য কোনো পণ্য হয়ে উঠেছিল, শিল্পকলার আসল বিষয় বস্তু।

(রমনি'র 'দ্য বোমন্ট ফ্যামিলি')

এখানে ভক্ষণযোগ্য বিষয়কে দেখার উপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এই ধরনের কোনো একটি শিল্পকর্ম এর শিল্পীর দক্ষতার চেয়ে আরো বেশি কিছু প্রকাশ করে। এটি এর মালিকের সম্পদ এবং তার স্বাভাবিক জীবনাচরণ সম্বন্ধেও ধারণা দেয়।

(ডে হিমের স্টিল লাইফ উইথ লবস্টার)

জীবজন্তু যেসব তৈলচিত্রের বিষয়: দেখা যায় সেগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাণীদের স্বাভাবিক জীবন নয় বরং গবাদিপশু, যাদের ভালো জাত বা পেডিগ্রির বিষয়টি বিশেষ যত্ন

সহকারে উপস্থাপন করা হয় তাদের মূল্যমানের প্রমাণ স্বরুপ এবং গবাদিপশুদের জাতকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করবার মাধ্যমে এর মালিকেরও সামাজিক মর্যাদাও প্রকাশ করে (প্রাণীদের আঁকা হয় যেন তারা চার পা যুক্ত কোনো আসবাব)।

স্টাবসের লিঙ্কনশায়ার অক্স

জড়পদার্থ বা নানা দ্রব্যের তৈলচিত্র : যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণভাবে সেই বস্তুগুলো অবজেক্ট ডা'র্ট নামে পরিচিত হয়েছিল ।

(ক্লেইজের স্টিল লাইফ)

ভবন বা দালানের চিত্রকর্ম - স্থাপত্যকলায় যে ভবনগুলোকে আদর্শ কোনো কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়নি, যেমনটা দেখা যায় রেনেসাঁর সূচনা পর্বের কিছু শিল্পীদের আঁকা ছবিতে Ñ তবে ভবনগুলো, স্থাবর সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে সেখানে।

হিউয়ার্টের চার্লস দ্য সেকেন্ড বিইং প্রেসেন্টেড উইথ এ পাইন্যাপল বাই রোজ)

তৈলচিত্রের সবচেয়ে উচ্চতম শ্রেণি ছিল ঐতিহাসিক অথবা পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর চিত্রকর্মগুলো। গ্রিক অথবা প্রাচীন কোনো বিষয়বস্তুর তৈলচিত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি জড় জীবন বা একটি প্রতিকৃতি কিংবা একটি ভূদৃশ্যের তুলনায় বিশেষ মযার্দার আসনটি পেতো। শুধুমাত্র অল্পকিছু ব্যতিক্রমী কাজ ছাড়া, যেখানে শিল্পী তার নিজস্ব কল্পনা শক্তির অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন, বাকি এইসব পুরাণের কাহিনী নির্ভর চিত্রকর্ম আজ আমাদের কাছে মনে হয় সবচেয়ে বেশি অন্তঃসারশূন্য; তাদের দেখতে যেন মনে হয়, ক্লান্ত কোনো ছবি, যা মোম দিয়ে তৈরি, যে মোম কখনোই গলবে না। তাসত্ত্বেও তাদের মর্যাদা এবং তাদের সারশূন্যতা সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

ধ্রুপদী প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিন গবেষণার ক্ষেত্রে খুব সম্প্রতি এবং কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে এমনকি আজও কিছু বিশেষ নৈতিক মূল্যবোধ আরোপিত করা হয়েছে। এর কারণ এই সব ধ্রুপদী পাণ্ডুলিপিগুলোর অন্তর্নিহিত মূল্য যা-ই হোক না কেন, তাদের নিজস্ব আদর্শে রূপায়িত আচরণগুলোকে একটি সামাজিক প্রথার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে এটি সমাজের শাসকশ্রেণির উপরের স্তরের সদস্যদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতি যোগান দেয়। ধ্রুপদী কবিতা, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ছাড়া ক্ল্যাসিকস বা ধ্রুপদী বিষয়গুলো আচরণের একটি পদ্ধতি নিবেদন করে। জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলোকে কীভাবে মর্যাদা দেয়া যায়, সেই বিষয়ে এগুলো কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করে, যা আমরা দেখতে পাই বিরোচিত কর্মকাণ্ড, ক্ষমতার সম্মানজনক অনুশীলন, আবেগময়তায়, সাহসিকতাপূর্ণ মৃত্যু এবং সুখের মহতী অনুসন্ধানে। এভাবে এগুলো প্রস্তাব করে যে, কীভাবে আমাদের জীবন কাটানো উচিৎ অথবা নিদেনপক্ষে উচিৎ, এভাবেই যে আমরা জীবনটা কাটাচ্ছি, সেটি যেন অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হয়।

(জোফানির মি. টাউনলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস ও স্প্র্যাঙ্গারের ট্রায়াম্ফ অব নলেজ)

তাহলে কেন এইসব তৈলচিত্র এতো অন্তঃসারশূন্য এবং যে দৃশ্যগুলো এগুলো আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে পুনঃসৃষ্টি করবার অভিপ্রায়ে, সেগুলো কেনই বা এতো অযত্নে সম্পাদিত কোনো নিয়মমাফিক কাজের মতো মনে হয়? আমাদের 'কল্পনাকে' প্ররোচিত করবার কোনো 'প্রয়োজন' যেন ছিল না তাদের, যদি সেটা করাই তাদের জন্যে জরুরী ছিল, তাহলে স্পষ্টতই তারা সেই উদ্দেশ্য সফল করার ক্ষেত্রে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। এইসব তৈলচিত্রের কিন্তু কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না, এর দর্শক-স্বত্তাধিকারীকে নতুন কোনো অভিজ্ঞতার জগতে প্রতিস্থাপিত করা বরং ইতিমধ্যেই দর্শক -স্বত্ত্বাধিকারী যে অভিজ্ঞতা ধারণ করেন, সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে অলংকৃত করাই ছিল এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইসব তৈলচিত্রের ক্যানভাসগুলোর সামনে দাড়িয়ে একজন দর্শক-স্বত্ত্বাধিকারী তার নিজস্ব আবেগ, দুঃখ এবং উদারতার একটি ধ্রুপদী রূপ দেখার অভিপ্রায় করেন। চিত্রকর্মে অঙ্কিত আদর্শায়িত সেই রূপটি যা সেখানে তিনি আবিষ্কার করেন, সেগুলো আসলে ছিল সাহায্য করবার কোনো উপাদান, একটি সহায়তা, তার নিজের সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি গড়তে যা সাহায্য করে। সেই সব দৃষ্টিগোচর আবির্ভাবে, তিনি তার নিজের সম্ভ্রান্ততার ছদ্মবেশ খুঁজে পান (বা তার স্ত্রী'র বা তার কন্যাদের)।

কখনো কখনো এই ধ্রুপদী ছদ্মবেশ ঋণ করার প্রক্রিয়াটি বেশ সরল, যেমন, রেনল্ডস-এর একটি চিত্রকর্মে সম্ভ্রান্ত একটি পরিবারের কন্যাদের আমরা সজ্জিত দেখতে পাই, গ্রেইসেস ডেকোরেটিং হাইমেন।

(রেনল্ডস-এর গ্রেইসেস ডেকোরেটিং হাইমেন)

কখনো কখনো তৈলচিত্রে সম্পূর্ণ পৌরাণিক কোনো দৃশ্য এমন ভাবে কাজ করে, যেন সেটি এর দর্শক-স্বত্ত্বাধিকারীর হাত গলিয়ে গায়ে পরার জন্য মেলে ধরা কোনো পরিধানযোগ্য বস্ত্র। মূল বিষয়টি হলো যে দৃশ্যটি যদিও অর্থপূর্ণ, কিন্তু সেই অর্থবহতার নেপথ্যে আছে একটি শূন্য স্থান, যা এই 'বস্ত্রটি' 'পরিধান' করার ব্যাপারটি সহজ করে তোলে

(জিরোদের ওসিয়ান রিসিভিং নেপোলিয়ান মার্শালস ইন ভালহালা)

তথাকথিত বিশেষ ঘরানার তৈলচিত্র, 'জনরা' চিত্র 'দরিদ্র মানুষের জীবন' ও তাদের জীবনাচরণের দৃশ্য সম্বলিত তৈলচিত্রগুলোকে ভাবা হয়ে থাকে এই সব পুরাণ কাহিনী নির্ভর চিত্রকর্মগুলোর বিপরীত। এই শ্রেণির চিত্রকর্মগুলো ছিল মহান কোনো গুণাবলীর চেয়ে অমার্জিত স্থূলতায় পূর্ণ। এই বিশেষ ঘরানার চিত্রকর্মগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রমাণ করা - ইতিবাচকভাবে অথবা নেতিবাচকভাবে - এই পৃথিবীতে 'সদগুণ' সামাজিক বা আর্থিক সফলতার মাধ্যমে পুরষ্কৃত হয়। এভাবেই যারা এইসব চিত্রকর্মগুলি ক্রয় করবার ক্ষমতা রাখেন - সাধারণত যে চিত্রকর্মগুলো স্বল্পমূল্যের হতো - তারা তাদের নিজস্ব সদগুণটি নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই চিত্রকর্মগুলো বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিলো, নব্য আগত বুর্জোয়াদের কাছে, যারা এই চিত্রকর্মে অঙ্কিত চরিত্রগুলো তাদের সহাবস্থানে আছে এমনটা ভাবেন না, বরং দৃশ্যটি যে নৈতিক মূল্যবোধে কথা প্রকাশ করছে, তার সাথে তারা একাত্মবোধ করেন। আবারো তৈলচিত্রের কোনো কিছুকে অর্থবহ করে ক্ষমতা বা দক্ষতা একটি আবেগপ্রবণ মিথ্যাকে আপাতগ্রাহ্য করে তোলে: যেমন সৎ এবং পরিশ্রমী মানুষরাই উন্নতি ও সমৃদ্ধশালী হতে পারেন এবং অর্কমণ্য, যাদের কিছু নেই তাদের কিছু পাবার অধিকারও নেই।

(ব্রুয়েরের 'ট্যাভার্ন সিন')

এড্রিয়েন ব্রুয়ের ছিলেন এই 'জনরা' ঘরানার একমাত্র ব্যতিক্রমী শিল্পী। তার আকায় সস্তা সরাইখানা এবং সেখানে বসবাস করা নিরুপায় মানুষদের তিনি তার চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন, তার চিত্রকর্মে তাদের সেই অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে তিক্ত ও প্রত্যক্ষ বাস্তববাদীতার সাথে, যেখানে আবেগপ্রবণ কোনো নৈতিক মূল্যবোধ আরোপের বিষয়টি আগে থেকেই পরিত্যাগ করা হয়েছে। এর পরিণতিতে আমরা দেখি তার চিত্রকর্ম কখনো কেউ ক্রয় করেনি অল্প কিছু ভিন্ন শিল্পী ছাড়া, যেমন রেমব্রান্ট এবং রুবেন্স।

গড়পড়তা 'জনরা' ঘরানার চিত্রকর্ম, এমনকি যখন সেটির হলসের মতো কোনো 'মাষ্টার' শিল্পীর আঁকা সেগুলো আসলেই ভিন্ন চরিত্রের হয়।

(হলসের ফিশার বয়)

এই মানুষগুলো সব দরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। শহরে বাইরের রাস্তায় বা গ্রামে দরিদ্র মানুষগুলোকে দেখা যেতে পারে। তবে বাসার ভেতরে দরিদ্র মানুষের দৃশ্য সম্বলিত চিত্র যদিও আমাদের আশ্বস্ত করে। এখানে অঙ্কিত দরিদ্র মানুষগুলো হাসছে যখন তারা তাদের দ্রব্যগুলো বিক্রি করবার জন্য সম্ভাব্য ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন (তাদের হাসিতে তারা তাদের দাঁত প্রদর্শন করছে, যা ধনী ব্যক্তিদের চিত্রে কখনো দেখা যায় না)। তারা স্বচ্ছল আর ক্রয় করতে সক্ষম, এমন শ্রেণির মানুষদের উপলক্ষ্যে হাসছেন অনুগ্রহোদ্দীপকভাবে - নিজেদের অনুগ্রহভাজন হিসেবে উপস্থাপন করে, কিন্তু একই সাথে একটি চাকরি বা কাজ পাওয়া বা কোনো কিছু বিক্রি করবার সম্ভাবনাও সেখানে সংযুক্ত। এই ধরনের চিত্রকর্মগুলো দুটো বিষয় প্রস্তাব করে: দরিদ্র মানুষেরা সুখী এবং অপেক্ষাকৃত ধনীরা এই পৃথিবীতে সকল আশার উৎস।

তৈলচিত্রের সবগুলো শ্রেণির মধ্যে ভূদৃশ্যচিত্র হচ্ছে একমাত্র শ্রেণি যেখানে আমাদের যুক্তি সবচেয়ে কম প্রযোজ্য।

পরিবেশবিদ্যার প্রতি সাম্প্রতিক আগ্রহ সৃষ্টি হবার আগে পুঁজিবাদী কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়বস্তু হিসেবে প্রকৃতিকে কখনো ভাবা হয়নি। বরং এটিকে ভাবা হতো একটি ক্ষেত্র হিসেবে, পুঁজিবাদ এবং সামাজিক জীবন এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তি মানুষের জীবন যেখানে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। প্রাকৃতিক নানা বিষয়গুলো বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল এবং সামগ্রিকভাবে - প্রকৃতি কারো অধিকৃত কোনো বিষয় ছিল না।

কেউ হয়তো বিষয়টিকে আরো সহজ করে বলতে পারেন। আকাশের এমন কোনো পৃষ্ঠদেশ নেই এবং তা অস্পৃশ্য; আকাশকে কোনো দ্রব্যে রূপান্তরিত করা সম্ভব

নয় কিংবা এর উপর পরিমাণবাচক কোনো গুণাগুণও আরোপ করা যায় না এবং ভূদৃশ্যচিত্র আঁকা শুরুই হয় আকাশ ও দূরত্ব চিত্রায়িত করবার সমস্যা নিয়ে ।

(রুজডেলের 'অ্যান এক্সটেনসিভ ল্যান্ডস্কেপ উইথ রুইনস')

প্রথম বিশুদ্ধ ভূদৃশ্যচিত্র আঁকা হয়েছিলো সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যান্ডে, যার সরাসরি কোনো সামাজিক প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা ছিল না (এর পরিণতিতে শিল্পী রুজডেলের ভাগ্যেও ঠিকমতো খাদ্য জোটেনি, আর হোবেমাকে হাল ছেড়ে দিতে হয়েছিলো)। ভূদৃশ্যচিত্র আঁকা সূচনা লগ্ন থেকেই অপেক্ষাকৃতভাবে একটি স্বাধীন কর্মকাণ্ড। এর শিল্পীরা স্বাভাবিকভাবেই এটি উত্তরাধিকার সূত্রে পান এবং সেই কারণেই তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ঐতিহ্যবাহী ধারাটিকে চলমান রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই, যখন তৈলচিত্র আঁকার প্রক্রিয়া ও উপস্থাপন পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেযোগ্য মাত্রায় পরিবর্তিত হয়েছে, সেখানেই প্রথম পরিবর্তনের পদক্ষেপটি এসেছে ভূদৃশ্যচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে। সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে ব্যতিক্রমী নতুন ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে , সেই সূত্রে আঁকার পদ্ধতিগত ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য শিল্পী যেমন, রুজডেল, রেমব্রান্ট (প রবর্তীতে তার কাজে আলো ব্যবহারের সূত্রপাত ঘটেছিল আসলে ভূদৃশ্যচিত্র অনুশীলনের মাধ্যমে), কনস্টেবল (তার রেখাচিত্রে), টার্নার) এবং এই সময়ের শেষ প্রান্তে মনে ও ইমেপ্রশনিস্ট শিল্পীরা। এছাড়াও তাদের উদ্ভাবনী কৌশল ক্রমান্বয়ে বাস্তবতায় অস্তিত্বশীল ও স্পর্শযোগ্যতা থেকে তৈলচিত্রকে অস্পষ্টতা ও অস্পৃশ্যতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

(জন ভ্যান গয়েনের ‘রিভার সিন উইথ ফিশারম্যান ল্যান্ডিং এ নেট)

(গেইনবোরো’র ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস অ্যান্ড্রিউজ)

তা সত্ত্বেও তৈলচিত্র ও সম্পত্তির মধ্যকার বিশেষ সম্পর্কটি ভূদৃশ্য চিত্রায়নের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শিল্পী গেইনসবোরোর মি. অ্যান্ড মিসেস অ্যান্ড্রিউজ শীর্ষক এই সুপরিচিত চিত্রকর্মটির কথা বিবেচনা করুন:

কেনেথ ক্লার্ক গেইনসবরো ও তার এই চিত্রকর্মটি সম্পর্কে লিখেছিলেন :

> পেশাগত জীবনের একেবারে সূচনা লগ্ন থেকে অনুপ্রাণিত করা সব দৃশ্যগুলোকে তিনি তার চিত্রকর্মের প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করতে আনন্দ অনুভব করতেন, যেভাবে তিনি খুব সংবেদনশীলতার সাথে সেই শস্যক্ষেতটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, যেখানে অ্যান্ড্রিউজ দম্পতি বসে আছে। এত গভীর ভালোবাসা আর দক্ষতা দিয়ে এই মনোমুগ্ধকর কাজটি আঁকা হয়েছে যে গেইনসবোরো এই ক্ষেত্রটিতে একই পথে আরো বহু দূর এগিয়ে যাবেন, আমাদের এমন কিছু প্রত্যাশা করাই উচিত ছিল। কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষ চিত্রকলা নির্মাণ পদ্ধতি পরিত্যাগ করেন এবং ছন্দময়, দৃষ্টিগ্রাহী চিত্রকলা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি বিবর্তিত করেন, যে চিত্রকর্মগুলোর জন্যই তিনি সুপরিচিত। তার সাম্প্রতিক জীবনীকারদের ধারণা যে, বাণিজ্যিক প্রতিকৃতি নির্মাণের কাজে বেশ ব্যস্ত থাকার কারণেই প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে চিত্রকলা নির্মাণে তিনি বেশি সময় দিতে পারতেন না, তবে তারা গেইনসবোরোর একটি বিখ্যাত চিঠির প্রতি তথ্যনির্দেশ করেছিলেন - যেখানে গেইনসবোরো মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি, ‘ প্রতিকৃতি আঁকতে আঁকতে বীতশ্রদ্ধ এবং ক্লান্ত এবং তিনি চাইছেন তার ভিওল দ্য গামবা (বাদ্যযন্ত্র) নিয়ে দূরে শান্ত মধুর কোনো গ্রামের পথে যাত্রা শুরু করবেন, যেখানে তিনি তার পছন্দ মতো ভূদৃশ্যচিত্র আঁকতে পারবেন’ - তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে যে, যদি গেইনসবরোর সেই সুযোগ থাকতো তবে তিনি অবশ্যই প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যচিত্রের শিল্পী হতেন। কিন্তু এই ভিওল দ্য গামবা চিঠিটি গেইনসবরোর রুসোইজমের (জাঁ জাক রুসোর মতবাদ, যেখানে আদিম, সরল জীবন যাপনে গুণকীর্তন এবং সেরকম জগতে প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হয়।) একটি দিক শুধুমাত্র। কিন্তু এই বিষয়ে তার মূল মতামত পাওয়া যায় একজন পৃষ্ঠপোষককে লেখা অন্য একটি চিঠিতে, যে পৃষ্ঠপোষক খুবই সরলতার সাথে তার বাগানের একটি চিত্রকর্ম এঁকে দেবার জন্য তাকে অনুরোধ করেছিলেন: ‘গেইনসবরো, মহামান্য লর্ড হার্ডউইকের প্রতি তার বিনম্র শ্রদ্ধা প্রকাশ করছেন এবং মহামান্য লর্ড হার্ডউইকের জন্য যে কোনো সেবায় নিজেকে নিবেদন করবার সুযোগ পেলে সবসময়ই তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান ও সম্মানিত মনে করেন। কিন্তু এই দেশের প্রকৃতি থেকে বাস্তব এমন কোনো ভূদৃশ্যের ব্যাপারে তার মতামত হচ্ছে, তিনি দেশে এমন কোনো সত্যিকারের ভূদৃশ্য কোথাও দেখেননি, যা কিনা গ্যাসপার) কিংবা ক্লডের চিত্রকর্মের সবচেয়ে অদক্ষতম অনুকরণেরও বিষয়বস্তু হবার যোগ্য হতে পারে।’

কেন লর্ড হার্ডউইক তার অধিকৃত এলাকার উদ্যানের একটি চিত্রকর্ম আঁকাতে চেয়েছিলেন? কেন মিষ্টার ও মিসেস অ্যান্ড্রিউজ তাদের নিজেদের জমিতে সহজেই চেনা যেতে পারে এমন কোনো একটি ভূদৃশ্যসহ তাদের প্রতিকৃতি আঁকার জন্য বিশেষ কমিশন দিয়েছিলেন শিল্পীকে?

রুশো যেমন কল্পনা করতেন, অ্যান্ড্রিউজ দম্পতি তেমন প্রকৃতির সাথে মিশে থাকা কোনো দম্পতি নয়; তারা ভূসম্পত্তির মালিক এবং পারিশ্বিকতার উপর তাদের মালিকানার দৃষ্টিভঙ্গি তাদের অভিব্যক্তি ও দেহভঙ্গিমায় সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

তাদের অধিকৃত সম্পদের প্রতি অ্যান্ড্রিউজ দম্পতির বিশেষ আগ্রহ রয়েছে এমন ইঙ্গিতের প্রত্যুত্তরে অধ্যাপক লরেন্স গোয়িং বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন:

> আমাদের এবং একটি সুন্দর চিত্রকর্মের দৃশ্যমান অর্থের মাঝখানে জন বার্জার নিজেকে কোনোভাবে পনুরায় প্রতিস্থাপিত করবার ক্ষেত্রে সফল হবার আগেই আমি কী একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি, আসলেই প্রমাণ আছে গেইনসবরো'র মিষ্টার ও মিসেস অ্যার্ড্রিউজ সেখানে শুধু সেই জমির মালিক হওয়া ছাড়াও আরো কিছু করছিলেন। স্পষ্টভাবে এই মূলভাবটি নিয়ে গেইনসবরোর শিক্ষক ফ্রান্সিস হেমানের একটি সমসাময়িক এবং প্রায় সমধর্মী ডিজাইন ইঙ্গিত করছে যে, এইসব দৃশ্যে উপস্থিত মানুষগুলো কোনো মহান আদর্শ .....নিষ্কলুষ আর অবিকৃত 'প্রকৃতির' নির্ভেজাল আলোর 'দার্শনিক আনন্দ' উপভোগে ব্যস্ত।

অধ্যাপকের যুক্তিটি এখানে উদ্ধৃতি হিসেবে উল্লেখ করা বিশেষভাবে জরুরী, কারণ এই মন্তব্যটি শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়টিকে যে কপটতাগুলো কলুষিত করেছে তারই একটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ। অবশ্যই খুবই সম্ভব হতে পারে যে মিষ্টার এবং মিসেস অ্যান্ড্রিউজ তাদের চারপাশের অবিকৃত প্রকৃতি থেকে দার্শনিক আনন্দ লাভে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু কোনোভাবেই এটি সেই সত্যকেও অসম্ভব করে তোলে না, যে তারা একই সাথে গর্বিত

ভূস্বামী। প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগতভাবে জমির মালিকানা থাকা ছিল এ ধরনের দার্শনিক আনন্দ উপভোগ করবার জন্য একটি পূর্বশর্ত, যা খুব একটা বিরল কোনো বিষয় ছিল না জমির মালিক অভিজাত শ্রেণিগোষ্ঠীর মধ্যে; তাদের এই 'নিষ্কলুষ ও অকৃত্রিম' প্র কৃতির আনন্দ উপভোগের প্রক্রিয়ায় যদিও সাধারণত অন্যান্য মানুষের প্রকৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সেই সময় অন্যায়ভাবে কারো সম্পত্তিতে ঢুকে পড়া, বুনো পশু পাখি শিকার বা মাছ ধরবার কঠোর শাস্তির বিধান ছিল, দ্বীপান্তর। আর যদি কেউ একটি আলু চুরি করবার ঝুকি নিত, ধরা পড়লে তাকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করবার হুকুম দিতে পারতেন ম্যাজিস্ট্রেট , অবশ্যই যিনি নিজেও সাধারণত একজন ভূস্বামী। সেই সময় সম্পত্তি মালিকানার ক্ষেত্রে কঠোর সীমাবদ্ধতা ছিল, যা কিনা প্রাকৃতিক হিসেবে বিবেচ্য হতো।

যে বিষয়টি এখানে বোঝানো চেষ্ঠা করা হয়েছে তা হলো, মিষ্টার ও মিসেস অ্যান্ড্রিউজের প্রতিকৃতি, তাদের মনে যে আনন্দানুভূতিগুলোর উদ্রেক করেছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ভূস্বামী হিসেবে আঁকার কারণে তারা যে 'আনন্দ' পেয়েছিলেন। এবং তাদের মালিকানাধীন ভূসম্পত্তিকে তার পূর্ণ বাস্তবতায় প্রদর্শিত করবার ক্ষেত্রে তৈলচিত্রের বিশেষ ক্ষমতা, এই সুখানুভূতিকে আরো বৃদ্ধি করেছিল। আর এটি হচ্ছে একটি পর্যবেক্ষণ, যা করা প্রয়োজন, সুনির্দিষ্টভাবে যার কারণ সাধারণত যে সাংস্কৃতিক ইতিহাস আমাদের শেখানো হয় সেটি এমন ভান করে যেন এই ধরনের কোনো পর্যবেক্ষণ মূল্যহীন।

ইউরোপীয় তৈলচিত্র নিয়ে আমাদের এই জরিপ ছিল খুব স্বল্প পরিসরে, সংক্ষিপ্ত এবং সেই কারণে খুব অপরিশোধিত। এটি বড় আকারের গবেষণার জন্য একটি সূচনা প্রকল্পের চেয়ে খুব বেশি কিছু নয়, যে গবেষণাটি সম্পাদন করবার দ্বায়িত্ব নেবেন হয়তো অন্য কেউ। কিন্তু এই প্রকল্পটির সূচনা বিন্দুটি স্পষ্ট হওয়া উচিৎ। তৈলচিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় গুণাবলীগুলো দৃশ্যমান কোন বিষয়বস্তুকে প্রতিনিধিত্ব করা প্রথাগত পদ্ধতিকে বিশেষ বিশেষত্ব প্রদাণ করে। আর এই সব নিয়ম কানুনগুলোর সমষ্টি হচ্ছে দেখার একটি দৃষ্টিভঙ্গি, যা উদ্ভাবিত হয়েছে তৈলচিত্র দ্বারা। সাধারণত বলা হয়, এর নিজস্ব ফ্রেমে বাধানো কোনো তৈলচিত্র হচ্ছে পৃথিবীমুখী কোনো কাল্পনিক খোলা জানালার মত। খুব অপরিশোধিতভাবে এটি প্রথাগত ঐতিহ্যেরই নিজস্ব রূপ, এমন কি কলাকৌশলগত সব ধরনের পরিবর্তনগুলো (ম্যানারিজম, বারোক, নিওক্ল্যাসিকাল, রিয়েলিস্ট ইত্যাদি), যা গত চার শতাব্দী ধরে ঘটেছে, তার জন্য জায়গা করে দেয়ার পরও এই কথাটি বলা যায়। আমাদের যুক্তি হচ্ছে কেউ যদি ইউরোপীয় তৈলচিত্রের সংস্কৃতিকে সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং যদি কেউ নিজের সম্বন্ধে এর নিজস্ব দাবিকে একপাশে সরিয়ে রাখতে পারেন, এর আদর্শ কিন্তু ফ্রেমে বাধানো পৃথিবী অভিমুখে কোনো খোলা জানালার মতো আর মনে হবে না; বরং মনে হবে যেন দেয়ালে গাঁথা কোনো সিন্দুক , যেখানে দৃশ্যমান সব কিছু সাজানো আছে।

আমরা অভিযুক্ত হয়েছি, সম্পদের ধারণাটি নাকি আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে আছে, কিন্তু সত্যটা আসলে বিপরীত দিকেই, সমাজ ও সংস্কৃতি, যা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে এখানে, তারাই মাত্রারিক্ত আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিছু নিয়ে উন্মত্তভাবে আচ্ছন্ন কোনো

মানুষের কাছে, তার উন্মত্ততার কারণ সবসময়ই অনুভূত হয়ে থাকে খুব স্বাভাবিক একটি বিষয় হিসেবে, স্বভাবতই সেকারণে সেটি আসলে কি, তা অজানাই থাকে তার কাছে। ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে শিল্পকলা আর সম্পদের সম্পর্ক আপাতঃদৃষ্টিতে খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয় মনে হয়, আর এর ফলশ্রুতিতে কোনো একটি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই সম্পদের প্রতি আগ্রহের বিস্তৃতিটি কেউ যদি দেখাতে পারেন, সাধারণত বিষয়টিকে চিহ্নিত করা হয় প্রদর্শনকারী গবেষকের অতিরিক্ত আগ্রহের প্রকাশ হিসেবে। আর এটাই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুযোগ করে দেয় তাদের নিজেদের মিথ্যা আর অযৌক্তিক প্রতিচ্ছবিটিকে আরো খানিকটা দীর্ঘ সময় ধরে প্রদর্শন করবার জন্য।

তৈলচিত্রের প্রয়োজনীয় মৌলিক চরিত্রটি অস্পষ্ট আর অবোধ্য হয়েছে, এর নিজস্ব 'ঐতিহ্যবাহী প্রথা' ও এর 'সেরা শিল্পী বা মাষ্টার্স'দের মধ্যবর্তী সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রায় সর্বজনীন একটি ভ্রান্ত ধারণার মাধ্যমে। কিছু খুব ব্যতিক্রমী শিল্পী, ব্যতিক্রম কিছু পরিস্থিতিতে এই প্রথার ধরাবাধা নিয়ম থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন এবং তারা যা সৃষ্টি করেছিলেন সেগুলো প্রথাগত ধারায় বিদ্যমান মূল্যবোধের সম্পূর্ণ বিপরীত। তা সত্ত্বেও এই সব শিল্পীদের প্রথাগত ধারা ও ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করা হয় : এই দাবি করবার বিষয়টি সহজতর করছে একটি সত্য, এই শিল্পীরা সবাই মৃত এবং প্রথাগত ঐতিহ্য তাদের শিল্পকর্মের সাথেই থেমে গেছে, এবং ছোটখাটো কিছু কৌশলগত নব্য উদ্ভাবন এটি আত্তীকৃত করে এমনভাবে তার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখেছে, যেন মনে হয় এর মূল নীতিগত বিষয়গুলোর আসলেই কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর এই কারণে রেমব্রান্ট, পুঁস্যা বা শার্দা বা গয়া কিংবা টার্নারের কোনো অনুসারী নেই, আছে শুধু আন্তরিকতাশূন্য বাহ্যত কিছু অনুকরণকারী।

প্রথাগত এই ঐতিহ্যর ধারা থেকে 'মহান শিল্পী' সংক্রান্ত একটি গৎবাধা কিংবা বলা যায় বৈশিষ্ট্যসূচক ধারণার উদ্ভব হয়েছিল। এই মহান শিল্পী হচ্ছে জীবন সংগ্রামে আকণ্ঠ নিমজ্জিত একজন পুরুষ; আংশিকভাবে এই সংগ্রাম বৈষয়িক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, আংশিক তার শিল্পকর্ম সম্বন্ধে বোধগম্যতার অভাবের বিরুদ্ধে এবং আংশিকভাবে সেই সংগ্রাম তার নিজের বিরুদ্ধে। এই মহান শিল্পীকে মাঝে মাঝে কল্পনা করা হয় তিনি যেন দেবদূতের সাথে মল্লযুদ্ধরত জ্যাকব (এই উদাহরণ বিস্তৃত মাইকেলেঞ্জেলো থেকে ভ্যান গো অবধি)। সংস্কৃতির আর কোনো অনুরূপ ধারা নেই যেখানে শিল্পীদের সম্বন্ধে এভাবে ভাবতে শেখানো হয়েছে। তাহলে কেন তা করা হয়েছে এই সংস্কৃতির ধারায়? আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছিলাম, উন্মুক্ত শিল্পকলার বাজারের অতিরিক্ত চাপের কথা, কিন্তু সংগ্রামটা শুধুমাত্র বেঁচে থাকার সংগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রতিটি মুহূর্তে যখনই কোনো একজন শিল্পী অনুধাবন করেছিলেন, চিত্রকর্মের বস্তুগত সম্পদের গুণকীর্তন করবার সীমাবদ্ধ ভূমিকা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট মর্যাদায় তিনি অসন্তুষ্ট, অনিবার্যভাবেই শিল্পী তার নিজেকে আবিষ্কার করেছেন তার 'নিজেরই শিল্পকলার' ভাষার সাথে সংগ্রামরত অবস্থায়, যে ভাষাটিকে কেবল বোধগম্য মনে করে তার পেশারই প্রথাগত ধারা।

দুই শ্রেণির ব্যতিক্রমী ও গড়পড়তার (সাধারণ গৎবাধা বৈশিষ্ট্যসূচক) কাজ আমাদের এই যুক্তির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু কোনো সমালোচনার মানদণ্ড হিসেবে তাদের যান্ত্রিকভাবে উপস্থাপন করা যাবে না। সমালোচককে অবশ্যই বিরুদ্ধবাদীতার শর্ত আর ভাষা অনুধাবন করতে হবে। প্রতিটি ব্যতিক্রমী অসাধারণ শিল্পকর্ম সুদীর্ঘ একটি সফল সংগ্রামের ফসল। অসংখ্য শিল্পকর্ম আছে যাদের সাথে সংগ্রামের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। সফল সংগ্রাম ছাড়াও আছে অসংখ্য প্রলম্বিত অসফল সংগ্রাম।

কোনো একজন চিত্রকর যার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিল প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী ধারায় এবং যিনি হয়তো ষোল বছর থেকে শিক্ষার্থী কিংবা শিষ্য হয়ে সেই ধারায় শিক্ষালাভ করেছেন, তার পক্ষে ব্যতিক্রমী অসাধারণ হয়ে উঠবার জন্য প্রয়োজন প্রথমত , তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত স্বরুপ অনুধাবন করা এবং পরবর্তীতে এটিকে তার প্রচলিত ব্যবহার, যার জন্য সেটি সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন করা। সম্পূর্ণ একাকী তাকে সংগ্রাম করতে হয় শিল্পকলার প্রচলিত রীতিনীতি আর ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে যা একসময় তার শিল্পী সত্তা গঠন করেছিল। একজন চিত্রকর হিসেবে তার নিজেকেই প্রথমত দেখতে হবে ঠিক সেভাবে, যেভাবে একজন চিত্রকর হিসেবে তার সেই দেখার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে তিনি নিজেকে এমন কিছু করতে দেখবেন যা এর আগে কেউ ভাবতে পারেননি। রেমব্রান্টের আঁকা এই দুটি আত্মপ্রতিকৃতি দেখলে আমরা বুঝতে পারবো, ঠিক কতটুকু প্রচেষ্টা এর জন্য করবার প্রয়োজন আছে।

প্রথম প্রতিকৃতিটি তিনি এঁকেছিলেন ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র আঠাশ বছর, আর দ্বিতীয়টি এর ত্রিশ বছর পরে আঁকা। কিন্তু এই দুটির মধ্যে পার্থক্য শুধু ‘বয়স শিল্পীর চেহারা আর চরিত্রকে পরিবর্তন করেছে’ এই সত্যটি অপেক্ষা আরো খানিকটা বেশি।

(রেমব্রান্টের পোর্ট্রেইট অব হিমসেল্ফ অ্যান্ড সাসকিয়া)

প্রথম চিত্রকর্মটি, বলা যেতে পারে, রেমব্রান্টের জীবনের চলচ্চিত্রে একটি বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। তিনি এটি এঁকেছিলেন তার বিবাহিত জীবনের প্রথম বছরে, এটিতে তিনি তার নববধূ সাসকিয়াকে দেখানোর জন্য সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন; এর পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যেই সাসকিয়া মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ধারণা করা হয়, এই চিত্রকর্মটি শিল্পীর জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়টিকে সামগ্রিকভাবে ধারণ করে আছে। কিন্তু এই তথ্য আরোপিত আবেগময়তা ছাড়াই যদি কেউ চিত্রকর্মটি পর্যবেক্ষণ করে দেখুন, তাহলে দেখা সম্ভব হবে, এখানে চিত্রায়িত সুখ যতটা আনুষ্ঠানিক, ততটা অনুভূত নয়। রেমব্রান্ট এখানে প্রচলিত প্রথাই ব্যবহার করেছেন তার প্রথাগত উদ্দেশ্যেই। তার স্বতন্ত্র কৌশল হয়তোবা ক্রমশ শনাক্তযোগ্য হয়ে উঠছিল তখন। কিন্তু সেটি নতুন কোনো শিল্পীর ঐতিহ্যবাহী প্রথায়, তার দ্বায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নতুন কোনো কৌশল ব্যবহারের প্রচেষ্টার অতিরিক্ত কিছু নয়। সামগ্রিকভাবে এই চিত্রকর্ম সেখানে চিত্রিত পাত্রপাত্রীদের

সৌভাগ্য, সম্মান এবং সম্পদের বিজ্ঞাপন (এইক্ষেত্রে শিল্পীর) এবং অন্য যে-কোনো বিজ্ঞাপনচিত্রের মতো এটিও অনুভূতিহীন।

(রেমব্রান্ট আত্মপ্রতিকৃতি)

এর পরের চিত্রকর্মটিতে তিনি এই প্রথাগত ধারাটিকে প্রথাগত ধারার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করেছিলেন। তিনি এই চিত্রটির ভাষাটিকে এর কাছ থেকে জোরপূর্বক আলাদা করে বের করে নিয়েছিলেন। এখানে তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষ। সবকিছু হারিয়ে গেছে যার, শুধু অস্তিত্বের একটি প্রশ্ন, একটি প্রশ্ন হিসেবে তার অস্তিত্বের অনুভূতি ছাড়া আর কিছু নেই। এবং তাঁর ভিতরের চিত্রকরÑ যিনিও কম বেশি একজন বৃদ্ধ মানুষ, অবশেষে ঠিক সেটাই প্রকাশ করবার উপায় খুঁজে পেয়েছেন, সেই মাধ্যমটাই ব্যবহার করে, যে মাধ্যমটি ঐতিহ্যগতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল এ ধরনের কোনো প্রশ্নকে পরিহার করবার জন্যে।

অধ্যায় ছয়

ইউরোপ সাপোর্টেড বাই আফ্রিকা অ্যান্ড আমেরিকা

পিটি

মিলডিউ ব্লাইটিং দ্য ইয়ারস অব কর্ন

সেল অব পিকচার্স অ্যান্ড স্লেভস ইন দ্য রোটান্ডা, নিউ অর্লিয়ন্স

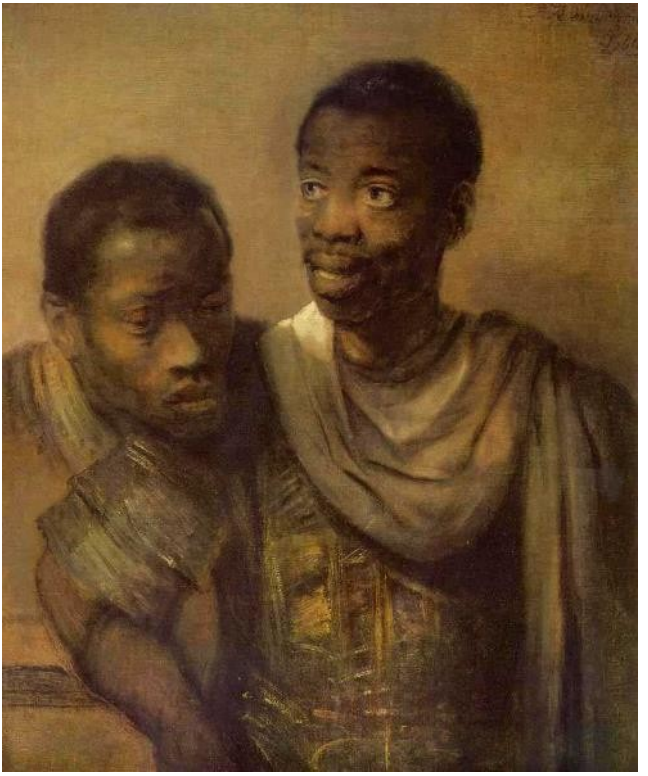

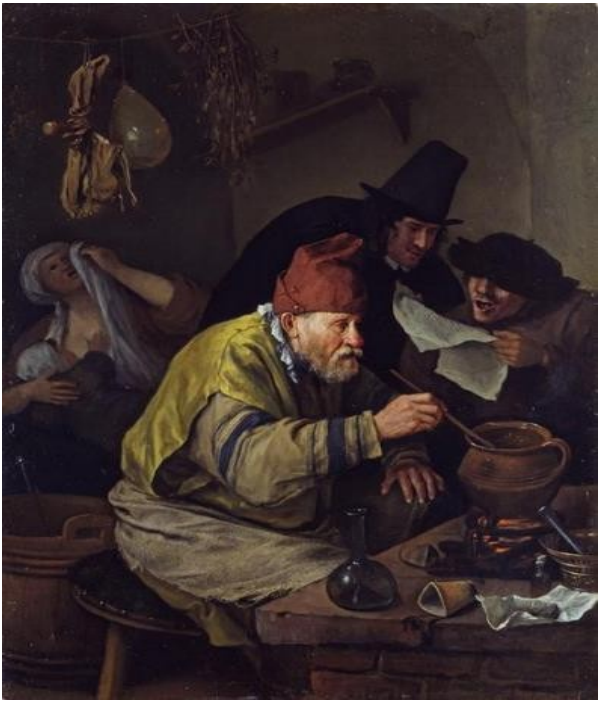

অধ্যায় সাত

যে শহরগুলোয় আমরা বসবাস করি, সেখানে জীবনের প্রতিদিনই আমরা সবাই শত শত বিজ্ঞাপনচিত্র দেখে থাকি। এভাবে এতো বেশি মাত্রায় আর কোনো ধরনের ছবিরই মুখোমুখি হই না আমরা।

ইতিহাসে আর কোনো প্রকারের সমাজেই বর্তমান সময়ের মতো চিত্রের যেমন এই ধরনের সর্বব্যাপিতা ছিল না, তেমনি এর এমন বাহুল্যময়তাও ছিল না।

এই সব বিজ্ঞাপনচিত্রের বার্তাগুলো, কেউ হয়তো মনে রাখতে বা ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য এটি আমাদের চেতনার স্তরে প্রবেশ করে এবং অন্তত মুহূর্তের জন্য আমাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা কিংবা স্মৃতি বা কল্পনাকে উস্কে দেয়। বিজ্ঞাপনচিত্রগুলো শুধু সেই বিশেষ একটি মুহূর্তের জন্য নির্মিত। আমরা এইসব বিজ্ঞাপনচিত্রকে দেখি পাতা উল্টাতে উল্টাতে বা কোনো রাস্তার মোড় ঘুরতে গিয়ে কিংবা কোনো বিজ্ঞাপনসহ গাড়ি যখন আমাদের পাশ দিয়ে চলে যায়। অথবা টেলিভিশনের পর্দায় যখন সেগুলো আমরা দেখি, যখন বিজ্ঞাপনের বিরতি শেষ হবার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। বিজ্ঞাপনের চিত্র আমাদের ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে সেই এক মুহূর্তের জন্য, এই কারণে একে বারবার পুনঃনবায়ন ও হালনাগাদ করবার প্রয়োজন হয়। তারপরও সেগুলো কখনো বর্তমানের কথা বলে না। প্রায়শই অতীতের প্রতি সেগুলো ইঙ্গিত দেয় ঠিকই, তবে সবসময় ভবিষ্যতের কথা বলে।

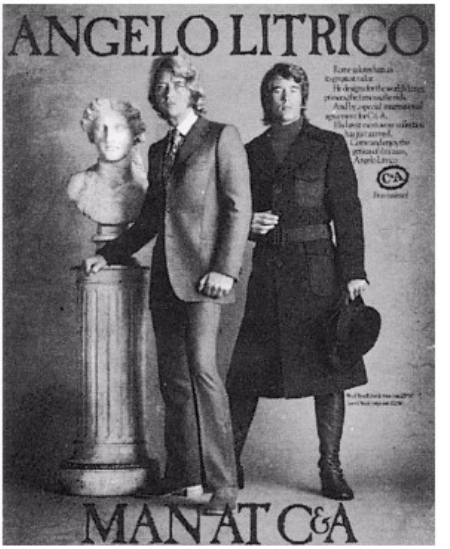

আমরা এখন এই সব বিজ্ঞাপনচিত্রগুলো দেখতে এতো বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, এদের সার্বিক প্রভাব আমরা কদাচিৎ খেয়াল করে থাকি। কোনো একজন হয়তো নির্দিষ্ট কোনো একটি চিত্রের দিকে মনোযোগ দেন, বা একটি নির্দিষ্ট কোনো তথ্য তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কারণ বিষয়টির প্রতি তার আগ্রহ আছে। কিন্তু আমরা সমস্ত বিজ্ঞাপনচিত্রের বিশাল সম্ভারটিকে গ্রহণ করে নেই, যেমন করে জলবায়ুর কোনো উপাদান মেনে নেই। যেমন ধরুন, এই যে বিজ্ঞাপনচিত্রগুলো কোনো একটি মুহূর্তে বন্দি হওয়া সত্ত্বেও যে ভবিষ্যতের কথা বলে, সেই সত্যটা আমাদের উপর একটি অদ্ভুত প্রভাব ফেলে, তবে বিষয়টি এতোই পরিচিত আমাদের কাছে যে, আমরা প্রায়শই বিষয়টি লক্ষ করি না। সাধারণত 'আমরাই' কোনো-না-কোনো বিজ্ঞাপনচিত্রকে এড়িয়ে যাই হাঁটার সময় কিংবা ভ্রমণ বা বইয়ের পাতা উল্টানোর সময়। টেলিভিশনের পর্দায় এটি খানিকটা ভিন্ন কিন্তু এমনকি তখনো আমরাই মূলত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছি, আমরা অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতে পারি চাইলেই, টেলিভিশনের আওয়াজ কমিয়ে দিতে পারি বা উঠে কফি বানাতে পারি। তা সত্ত্বেও যে কারো মনে হতে পারে বিজ্ঞাপনচিত্র আমাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে নিরন্তর, যেন কোনো এক্সপ্রেস ট্রেন দূরের গন্তব্যের দিকে ছুটে যাচ্ছে। আমরা স্থির, তারা গতিশীল, যতক্ষণ না খবরের কাগজ ছুড়ে ফেলছি, বা টেলিভিশনের প্রোগ্রাম শুরু হয় বা পোষ্টারের উপর নতুন কোনো পোষ্টার বসছে।

প্রচারণা বা বিজ্ঞাপনশিল্পকে সাধারণত খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যাখ্যা ও দাবি করা হয়, যা শেষ অবধি সব মানুষ (যারা ভোক্তা) এবং সবচেয়ে দক্ষ পণ্য নির্মাতা এবং এভাবেই জাতীয় অর্থনীতির উপকারে আসে। এটি খুব ঘনিষ্ঠভাবে স্বাধীনতার কিছু বিশেষ ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন ক্রেতার নির্বাচন ও নির্মাতার ব্যবসা করার স্বাধীনতা। পুঁজিবাদী অর্থনীতির শহরগুলোয় বিশাল সাইনবোর্ডগুলো আর

প্রচারণার নিয়ন সাইনগুলো আসলেই ‘মুক্ত পৃথিবীর’ খুবই তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান চিহ্ন।

পূর্ব-ইউরোপের অনেকের জন্য পশ্চিমের এই বিজ্ঞাপনচিত্রগুলোর মোটামুটি যে মূল কথাটি বলে সেটি হচ্ছে, পূর্বে তাদের কোন কোন জিনিসের অভাব আছে। ভাবা হয়ে থাকে, বিজ্ঞাপন প্রচারণা, কোনো কিছু মুক্তভাবে পছন্দ করবার জন্যে একটি স্বাধীনতা প্রদান করে।

অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, বিজ্ঞাপন প্রচারণায় কোনো নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীগুলো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু এটাও সত্যি প্রতিটি বিজ্ঞাপনচিত্র পারস্পরিক যাচাই-বাছাই কিংবা নিশ্চিৎকরণ আর পারস্পরিক ভিন্নতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। সেই কারণে বিজ্ঞাপন প্রচারণা শুধু মাত্র পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত এমন অসংখ্য চিত্রের সম্ভার আর বার্তা নয়: এটি নিজেই একটি ভাষা, যা সর্বক্ষণ ব্যবহৃত হয় একই সাধারণ প্রস্তাব ভোক্তাদের সামনে তুলে ধরবার জন্য। প্রচারণার অভ্যন্তরেই ভিন্ন ভিন্ন পণ্য বাছাই করবার সুযোগ প্রস্তাব করা হয়, যেমন এই ক্রিমের বদলে ঐ ক্রিমটি , এই গাড়িটা বদলে অন্য গাড়িটা, কিন্তু বিজ্ঞাপন প্রচারণা একটি পদ্ধতি যা শুধু মাত্র একটি মাত্র সাধারণ প্রস্তাবই করতে পারে।

আমাদের প্রত্যেকের কাছেই এটি প্রস্তাব করে যে, আমরা আমাদের কিংবা আমাদের জীবনকে রূপান্তর করতে পারবো, কোনো কিছু বাড়তি পরিমানে ক্রয় করবার মাধ্যমে।

আর এই বাড়তি কিছু, এটি দাবি করে, আমাদের কোনো না কোনো উপায়ে বহুগুণে সমৃদ্ধ করে, এমন কি যদিও তা কিনতে গিয়ে আমরা দরিদ্রতর হচ্ছি অর্থ ব্যয় করবার মাধ্যমে ।

আপাতদৃষ্টিতে এই ধরনের কোনো রূপান্তর যে সম্ভব সেটি বিশ্বাস করতে বিজ্ঞাপনচিত্র আমাদের প্ররোচিত করে তাদের প্রস্তাবনা অনুযায়ী পথ অনুসরণ করে যারা নিজেদের রূপান্তরিত করেছে, তাদের উদাহরণ প্রদর্শন করবার মাধ্যমে, এবং যারা এর কারণে ঈর্ষাযোগ্য। আর ঈর্ষণীয় হবার উপযুক্ত হয়ে ওঠার এই পরিস্থিতিটাই আকর্ষণীয়ভাবে মোহময় হয়ে ওঠা বা 'গ্ল্যামার' বিষয়টি তৈরি করে। আর বিজ্ঞাপন প্রচারণা হচ্ছে এই গ্ল্যামার বা মোহনীয় আকর্ষণ নির্মাণ করবার একটি প্রক্রিয়া।

এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে, বিজ্ঞাপন প্রচারণার সাথে এটি যে পণ্যের বিজ্ঞাপন করছে, সেটি থেকে আনন্দ বা উপকারিতা পাওয়ার বিষয়টিকে সমার্থক ভেবে সংশয়গ্রস্ত না হওয়া। প্রচারণা খুবই কার্যকর কারণ এটি বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে পুষ্ট হয়। কাপড়, খাদ্য, গাড়ি, প্রসাধন সামগ্রী, সূর্যের আলো সবকিছুই কিন্তু এদের নিজেদের বৈশিষ্ট্যের কারণে উপভোগ করা সম্ভব। প্রচারণা প্রক্রিয়াটি আনন্দ অনুভব করবার প্রাকৃতিক যে একটি চাহিদা, তার উপরে কাজ করবার মাধ্যমে শুরু হয়। কিন্তু এটি সেই আনন্দ অনুভব করার মূল উপাদানটিকে সরবরাহ করতে পারে না, আনন্দ অনুভব করবার ব্যকরণে আনন্দের কোনো বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প নেই। যতই বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে কোনো বিজ্ঞাপন বহু দুরের উষ্ণ কোনো সাগরে স্নান করবার আনন্দ বোঝানোর চেষ্টা করবে, ততই দর্শক-ভোক্তা সচেতনভাবেই অনুভব করতে পারবে, সেই সাগর থেকে তিনি শত শত মাইল দুরে, এবং ততই তার কাছে সেই সাগরের পানিতে স্নান করবার সম্ভাবনা আরো বেশি ধরা ছোঁয়ার বাইরে দূরবর্তী কোনো কিছু মনে হবে। আর সেই কারণে প্রচারণা বা বিজ্ঞাপনচিত্রের বার্তা আসলে এমন কোনো কিছু বা সুযোগ সংক্রান্ত হওয়া উচিত নয়, যা কিনা কোনো ভোক্তা এখনো উপভোগ করেননি, এমন কোনো বিষয়ে প্রস্তাবনা দেয়। প্রচারণা কখনোই আনন্দের খাতিরে আনন্দের গুণগান করে না। প্রচারণা সবসময় ভবিষ্যতের ক্রেতার জন্য, এটি তার জন্য সেই দৃশ্যকল্প সৃষ্টি করে যা তাকে আরো বেশি আকর্ষণীয় আর মোহময় করে তোলে সেই জিনিস বা সুযোগটি দিয়ে, যা বিজ্ঞাপনটি তার কাছে বিক্রি করার চেষ্টা করছে। এরপর সেই দৃশ্যকল্পটি তাকে, সে যা হতে পারতো, তার প্রতি ঈর্ষান্বিত করে তোলে। কিন্তু আসলেই কি যা কিনা এই 'সে-যা-হ তে-পারে' তা ঈর্ষাযোগ্য করতে পারে? তার প্রতি অন্যদের ঈর্ষা। বিজ্ঞাপন প্রচারণা সামজিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট, কোনো বস্তু বা দ্রব্য সংশ্লিষ্ট নয়। এটি আনন্দ নয় বরং সুখ দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় - বাইরে থেকে অন্যরা বিচার করতে পারে এমন সুখ। ঈর্ষণীয় হবার সুখই হচ্ছে আকর্ষণীয় মোহময় গ্ল্যামার।

ঈর্ষণীয় হওয়া আশ্বাসবোধের নিঃসঙ্গ একটি রূপ। কারণ এটি নির্দিষ্টভাবে নির্ভর করে, যারা আপনাকে ঈর্ষা করছে তাদের সাথে আপনার অভিজ্ঞতাটি ভাগাভাগি না করবার শর্তের উপর। উৎসুকভাবে আপনাকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে কিন্তু আপনি কোনো কিছু উৎসাহের সাথে পর্যবেক্ষণ করছেন না। আপনি যদি তা করেন, তাহলে আপনি কম ঈর্ষণীয় এমন কোনো ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হবেন। এই ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় ব্যক্তিরা হচ্ছেন আমলাদের মতো; যতটা বেশি তারা নৈর্ব্যাক্তিক হবেন, ততটাই বেশি (তাদের নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্য) আমাদের দৃষ্টিতে অনুভূত হয় তাদের তথাকথিত ক্ষমতার পরিধি। আকর্ষণীয় মোহময়দের ক্ষমতার বসবাস তাদের সুখ সংক্রান্ত আমাদের ধারণায় : আমলাদের ক্ষমতা তাদের ক্ষমতা সংক্রান্ত আমাদের ধারণায়। এটাই ব্যাখ্যা করে বহু আকর্ষণীয় আর মোহময় চিত্রে পাত্রপাত্রীদের সেই অনুপস্থিত, আনমনা, লক্ষ্যহীন দৃষ্টি। তারা তাকিয়ে আছেন তাদের প্রতি ঈর্ষার সব দৃষ্টিপাতগুলোকে উপেক্ষা করে, যা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছে।

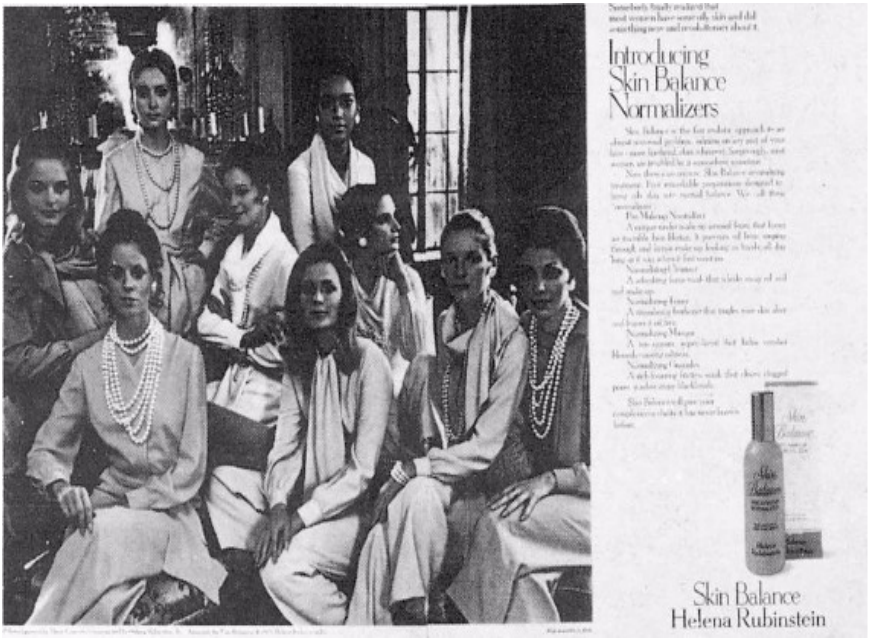

কোনো দর্শক-ক্রেতা তার সেই পরিবর্তিত নিজেকেই ঈর্ষা করবে, যে রূপে তিনি রূপান্তরিত হবেন সেই পণ্যটি যখন তিনি কিনবেন। তিনি নিজেকে কল্পনা করতে চান সেই বিজ্ঞাপিত পণ্যটি দিয়ে পরিবর্তিত হওয়া নতুন কোনো একজন হিসেবে, যে হবে সবার ঈর্ষাযোগ্য। যে ঈর্ষা তাকে তার নিজের প্রতি ভালোবাসাটিকেও যথার্থতা দেবে। অন্যভাবেও বিষয়টি বলা যেতে পারে: বিজ্ঞাপনের চিত্র, মানুষটি নিজে আসলে যেমন, সত্যিকার সেই মানুষটার প্রতি তার ভালোবাসাকে চুরি করে আর বিজ্ঞাপিত পণ্যের বিনিময় মূল্য হিসেবে সে তাকে পুনরায় সেই ভালোবাসাকে ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব দেয়।

বিজ্ঞাপনী প্রচারণার ভাষার সাথে তৈলচিত্রের কী কোনো যোগসূত্রতা আছে, যা ক্যামেরা আবিষ্কার হওয়া পর্যন্ত প্রায় চার শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো কিছু দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাধান্য বিস্তার করে এসেছে?

সেই প্রশ্নগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম, এর উত্তর সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা পেতে চাইলে যা জিজ্ঞাসা করতেই হবে। এখানে সুস্পষ্টভাবে সরাসরি একটি ধারাবাহিক ক্রমান্বয়তা আছে। সাংস্কৃতিক মর্যাদার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে শুধু অস্পষ্ট করেছে। আবার একই সাথে ধারাবাহিকতা ছাড়াই একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে, যা পরীক্ষা করে দেখা কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বিজ্ঞাপনী প্রচারণার চিত্র প্রায়শই ভাস্কর্য কিংবা চিত্রকর্ম ব্যবহার করে থাকে, এর নিজস্ব বার্তায় কর্তৃত্ব কিংবা আকর্ষণীয়তার গুণাবলি আরোপ করবার প্রয়াসে। বাঁধানো তৈলচিত্র হরহামেশাই দোকানের জানালায় প্রদর্শিত হয় তাদের প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে।

বিজ্ঞাপনী প্রচারণা সংস্থার মাধ্যমে কোনো শিল্পকর্ম যখন 'উদ্ধৃত' হয়, তখন তার দুটি উদ্দেশ্য থাকে। শিল্পকলা প্রাচুর্য আর স্বাচ্ছন্দের অংশ, এটি আসবাবপত্রের একটি অংশ, যা পৃথিবী, ধনী এবং সুন্দর মানুষদেরকে উপহার হিসেবে নিবেদন করে।

কিন্তু কোনো একটি শিল্পকর্ম সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বের ভাষাও প্রকাশ করে, এক ধরনের মর্যাদার রূপকে প্রতিনিধিত্ব করে, এমন কি প্রজ্ঞারও, যা কোনো স্থূল রুচির কদাকার বস্তুবাদী লালসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কোনো একটি তৈলচিত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ; সুরুচিপূর্ণ সংস্কৃতিমনা ইউরোপীয় বলতে যা বোঝায়, সেটি তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর সে কারণে কোনো উদ্ধৃত শিল্পকর্ম (আর এ কারণে বিজ্ঞাপন প্রচারণায় তারা যথেষ্ট উপযোগিও) দুটি বিপরিতমুখী বিষয় প্রকাশ করে একই সাথে: এটি নির্দেশনা করে সম্পদ ও আধ্যাত্মিকতার, যা ইঙ্গিত করে, যে পণ্যটি ক্রয় করবার প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে সেটি একই সাথে বিলাসিতা ও সাংস্কৃতিকভাবে মূল্যবান। সত্যিকারভাবে চিত্রকর্মের ঐতিহ্যবাহী ধারাটি বোঝার ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন প্রচারণা মূলত শিল্পকলার অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের চেয়ে অনেক বেশি ও বিস্তারিতভাবে সফল হয়েছে। কারণ বিজ্ঞাপন প্রচারণা অনুধাবণ করতে পেরেছে, কোনো শিল্পকর্মের সাথে এর দর্শক-ক্রেতার সম্পর্কের প্রভাবটি এবং যা ব্যবহার করে এটি চেষ্টা করে দর্শক-ক্রেতাদের প্রলুব্ধ আর প্ররোচিত করবার জন্য।

যদিও তৈলচিত্র এবং বিজ্ঞাপন প্রচারণার মধ্যে ধারাবাহিকতাটি, কোনো বিশেষ চিত্রকর্ম 'উদ্ধৃত' করবার মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়, কারণ এর আরো গভীর অর্থ আছে। প্রচারণা বহুলাংশে তৈলচিত্রের ভাষার উপর নির্ভরশীল। এটি একই সুরে ও কণ্ঠে একই বিষয় নিয়ে কথা বলে, কখনোও এই দৃশ্যগত সংযোগ এতটাই সদৃশ্যতার, যে 'স্ন্যাপ' গেম খেলাও সম্ভবপর হয়, একই বা প্রায় একই ছবি বা কোনো ছবির বিস্তারিত কোনো অংশের দৃশ্য পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে।

Jeanne d'Arc

IS IT FUR REAL?

Enslave him with magic.
Holiday Magic.

বহু বিজ্ঞাপনী চিত্রে অতীতের কোনো শিল্পকর্মেও প্রতি সরাসরি ইঙ্গিত থাকে। কখনো পুরো ছবিটি হতে পারে সুপরিচিত কোনো চিত্রকর্মের সরাসরি একটি অনুকরণ প্রচেষ্টা।

যদিও দৃশ্যগতভাবে হুবুহু সদৃশ্যতার পর্যায়ে নয়, যেখানে ধারাবাহিকতা গুরুত্বপূর্ণ; এটি যে একগুচ্ছ প্রতীক ব্যবহার করেছে সেই পর্যায়ে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রচারণার চিত্রগুলোর সাথে এই বইয়ের কোনো চিত্রকর্মের সাথে তুলনা করে দেখুন বা কোনো একটি ছবির পত্রিকা বা কোনো দৃষ্টিনন্দন আধুনিক শপিং স্ট্রিট ধরে এর জানালায় প্রদর্শনীগুলো দেখুন, এরপর ছবিসহ কোনো মিউজিয়ামের ক্যাটালগের পাতা উল্টে দেখুন এবং লক্ষ্য করুন দুটি মাধ্যমে (তৈলচিত্র এবং বিজ্ঞাপনচিত্র) যে বার্তাগুলো দেয়া হচ্ছে তাদের মধ্যকার সদৃশ্যতাটিকে। একটি পদ্ধতিগত গবেষণা করবারও প্রয়োজন আছে এই ক্ষেত্রে, এখানে আমরা বেশ কিছু উদাহরণ দিতে পারি যা যেখানে কৌশল আর উপায়ের সদৃশ্যতা লক্ষণীয়।

মডেলদের অঙ্গভঙ্গি (ম্যানেকিন) এবং পুরাণ কাহিনীর চরিত্ররা।

প্রকৃতির নানা উপাদানের (পাতা, বৃক্ষ, পানি) রোমান্টিক ব্যবহার, যার মাধ্যমে একটি আবহ বা পরিবেশ সৃষ্টি করবার চেষ্টা যেখানে পুনরায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, নিষ্কলুষ নিষ্পাপ জীবনকে।

ভূমধ্যসাগরীয় তীরবর্তী অঞ্চলগুলোর প্রতি একটি বিস্ময়কর এবং স্মৃতিবেদনাময় আকর্ষণ।

নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গি যা নারীদের পৃথক সামাজিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্যসূচক : শান্ত মৌন মা (ম্যাডোনা), মুক্ত স্বাধীন কোনো সহকারী (অভিনেত্রী, রাজার রক্ষিতা), নিখুঁত কোনো গৃহকর্ত্রী (দর্শক—ক্রেতার স্ত্রী), যৌন আবেদনময়ী (ভেনাস, চমকে ওঠা জলপরী) ইত্যাদি।

নারীদের পায়ের উপর বাড়তি যৌন আকর্ষণের বৈশিষ্ট্য আরোপ।

সে সব দ্রব্য যাদের বিশেষ করে ব্যবহার করা হয় বিলাসিতাকে প্রকাশ করতে: যেমন খোদাই করা ধাতব কোনো পদার্থ, পশমী কাপড়, পালিশ করা চর্মজাত দ্রব্য ইত্যাদি।

প্রেমিক-প্রেমিকাদের অঙ্গভঙ্গি এবং আলিঙ্গন, যা দর্শকের সুবিধার্থে মুখোমুখিভাবে সাজানো হয় ।

নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়া সমুদ্র।

শারীরিক ভঙ্গিমা সেই সব পুরুষদের, যা তাদের সম্পদ এবং শৌর্যকে ইঙ্গিত করছে।

দর্শনানুপাতের ব্যবহার করে দূরত্বকে বোঝানো, রহস্যময়তা নিবেদন করা।

মদ্যপান করা ও সফলতার সমীকরণ।

বীর নাইট বেশে পুরুষরা (যারা ঘোড়ায় সওয়ার) রূপান্তরিত হয়েছে গাড়ির চালকে।

বিজ্ঞাপন প্রচারণা তৈলচিত্রের দৃশ্যের ভাষার উপর কেন এত নির্ভরশীল?

ভোক্তা সমাজের সংস্কৃতি হচ্ছে বিজ্ঞাপন প্রচারণা। চিত্রের মাধ্যমে এটি বিস্তার লাভ করে, যা সমাজের নিজের উপর তার বিশ্বাসটিকে প্রকাশ করে । বেশ অনেকগুলোই কারণ আছে কেন এই সব চিত্রগুলো তৈলচিত্রের ভাষা ব্যবহার করে।

তৈলচিত্র, এটি কোনো কিছু হবার আগে, মূলত এটি ছিল ব্যক্তিগত ধনসম্পদ প্রদর্শন করবার উচ্ছাসময় একটি প্রক্রিয়া মাত্র। শিল্পকলার কোনো একটি রূপ হিসেবে এটির মূল উৎস সেই মূলনীতিটি, 'আপনার যা আছে আপনি তাই'।

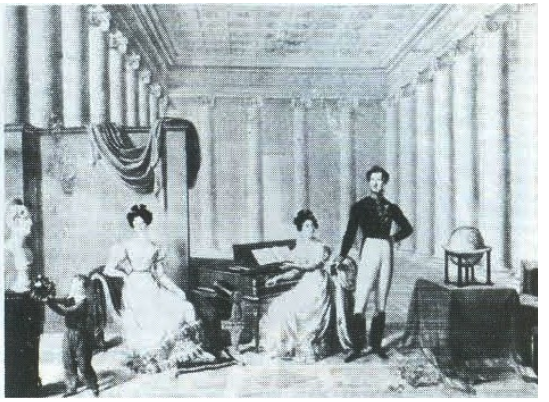

বিজ্ঞাপন প্রচারণার চিত্র রেনেঁসা পরবর্তী ইউরোপে দৃশ্যমান শিল্পকলায় বাড়তি সংযোজন করছে এমন ভাবনা ভ্রান্তিপূর্ণ, এটি সেই শিল্পকলার সর্বশেষ মরোণোন্মুখ একটি রূপ।

বিজ্ঞাপন প্রচারণা এর মূল অর্থে স্মৃতিবেদনাময় বা নস্টালজিক, কারণ ভবিষ্যতের কাছে অতীতকে বিক্রি করতে হয় এটিকে। এটি এর নিজের করা দাবীসমুহের স্বাভাবিক ন্যূনতম বিষয়টিও সরবরাহ করতে পারে না। সুতরাং গুণগতমান বৃদ্ধি সংক্রান্ত এর সব তথ্যসূত্র অতীতমুখী এবং ঐতিহ্যবাহী। যদি এটি কঠোরভাবে সমসাময়িক ভাষা ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এর না থাকবে কোনো আত্মবিশ্বাস, না থাকবে কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা।

বিজ্ঞাপন প্রচারণার নিজ স্বার্থে গড়পড়তা দর্শক-ক্রেতার সাধারণ ও প্রথাগত শিক্ষাকে ব্যবহার করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। ইতিহাস, পুরাণ, কবিতা সম্বন্ধে স্কুলে যা কিছু সে শিখেছে, তার সবকিছুই ব্যবহার করা যেতে পারে গ্ল্যামার বা আকর্ষণীয় মোহময়তা উৎপাদন করবার জন্য। চুরুট বা সিগারেট বিক্রি করা যেতে পারে কোনো এক রাজার নামে, স্ফিঙ্কস-এর সাথে সংযোগের মাধ্যমে অন্তর্বাস, শহর থেকে দূরে প্রকৃতির মাঝে কোনো বাড়িকে যেমন গাড়ি বিক্রি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

তৈলচিত্রের ভাষায় এইসব অস্পষ্ট ঐতিহাসিক বা কাব্যিক বা নৈতিকতার তথ্যযোগ উপস্থিত থাকে সবসময়ই। সেই ভাষাটি যে নির্ভুল বা সুনির্দিষ্ট না আর অবশেষে যা অর্থহীন, এই বাস্তব সত্যটি আসলে সুবিধাজনক তার জন্যে: তাদের বোধগম্য হবার কোন বাধ্যবাধকতা নেই, তাদের শুধু অতীতের আংশিক সাংস্কৃতিক শিক্ষার প্রতি অস্পষ্ট স্মৃতিবাহী বা ইঙ্গিতময় হলেই চলবে। প্রচারণা সব ইতিহাসকে পৌরাণিক কোনো কাহিনীতে রূপান্তরিত করে, কিন্তু কার্যকরভাবে সেটি করতে গেলে তার প্রয়োজন হয় একটি দৃষ্টিনির্ভর ভাষা যার ঐতিহাসিক মাত্রায় কোনো অর্থবহতা আছে।

পরিশেষে, একটি কারিগরী উন্নতি, তৈলচিত্রের ভাষাকে বিজ্ঞাপন প্রচারণার বহু চর্চিত ভাষায় অনূদিত করবার বিষয়টিকে সহজতর করে তোলে। এটি একটি আবিষ্কার ছিল, যা পনেরো বছর আগে উদ্ভাবিত হয়েছিল, সেই আবিষ্কারটি হচ্ছে সস্তা রঙ্গীন আলোকচিত্র। এই ধরনের কোনো আলোকচিত্র কোনো একটি বিষয়বস্তুর রং এবং তার গঠনগত বৈশিষ্ট্যসূচক বিন্যাস, বুনট সব কিছুকে পুনর্মুদ্রন করতে সক্ষম হয়ে ওঠে, যা অতীতে কেবল তৈলচিত্রের পক্ষে সম্ভব ছিল। কোনো দর্শক-মালিকের কাছে তৈলচিত্রের যে অবস্থানটি ছিলো, রঙ্গীন আলোকচিত্রের সেই একই অবস্থান দর্শক-ক্রেতারদের কাছে।

দুটি মাধ্যমে একই রকম অত্যন্ত স্পর্শগ্রাহ্য কোনো উপায় ব্যবহার করে, যা দর্শকের ইন্দ্রিয়কে সরাসরি স্পর্শ করে, যা কোনো মানুষকে প্ররোচিত করে কোনো চিত্রে প্রদর্শিত পণ্যগুলো অর্জন বা তার মালিক হবার জন্য। উভয় ক্ষেত্রে দর্শকের অনুভূতি হচ্ছে , তিনি সত্যি সত্যি প্রায় একেবারে সেই সব জিনিসগুলোকে স্পর্শ করতে পারবেন। আর সেই চিত্রে প্রদর্শিত পণ্যগুলো তাকে মনে করিয়ে দেয় কি ভাবে সে আসল জিনিসগুলোর মালিক হবে বা হতে পারে।

কিন্তু তারপরও দুটি মাধ্যমের এই ধারাবাহিকতার ভাষা সত্ত্বেও, বিজ্ঞাপন প্রচারণার মূল কাজটি তৈলচিত্র থেকে খুবই ভিন্ন। কারণ পৃথিবীর বাস্তবতার সাথে একজন দর্শক-ক্রেতার যা সম্পর্ক তার থেকে একজন দর্শক-মালিকের সম্পর্ক খুবই ভিন্ন।

কোনো তৈলচিত্র প্রদর্শন করে এর মালিকের জীবনাচরণ এবং তিনি তার নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে কি ইতিমধ্যেই ভোগ করছেন। তার নিজস্ব মূল্য সম্বন্ধে তার নিজের বোধটাকে দৃঢ় আর সংহত করে। তিনি ইতিমধ্যে যে অবস্থানে আছেন, নিজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটিকে এটি তার চেয়ে আরো উচ্চমাত্রায় নিয়ে যায়। এটি শুরু হয় বাস্তব তথ্য নির্ভর হয়ে, তার জীবনের বাস্তব তথ্য। তৈলচিত্র তার সেই অন্দরমহলকে আরো অলংকৃত করে , বাস্তবে যেখানে তার মালিক বসবাস করে।

বিজ্ঞাপন প্রচারণার উদ্দেশ্য এর দর্শককে তার বর্তমান জীবনাচরণের প্রতি খানিকটা অসন্তুষ্ট করে তোলা। সমাজে কি হচ্ছে সেটা নিয়ে কিন্তু অসন্তুষ্ট করা হচ্ছে না তাকে, বরং শুধুমাত্র সেই সমাজের অভ্যন্তরে তার নিজস্ব জীবনটার প্রতি নির্দেশিত এই প্রচারণা। এটি প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যদি সে তার প্রতি নিবেদিত বিজ্ঞাপিত পণ্যটি ক্রয় করে, তার জীবন বর্তমানের চেয়ে আরো উত্তম হবে। এবং দর্শক-ক্রেতা নিজে যা, এটি তার চেয়ে উন্নত একটি বিকল্পকে নিবেদন করে।

যারা বাজার থেকে ইতিমধ্যেই অর্থ উপার্জন করেছেন, তৈলচিত্র তাদের প্রতি নির্দেশিত। আর বিজ্ঞাপন প্রচারণার দর্শক তারা, যারা সেই বাজারটি গঠন করে, তারা আবার ভোক্তা

-উৎপাদনকারীও, যাদের কাছ থেকে দুইবার মুনাফা হাতিয়ে নেয়া যায়, প্রথমে শ্রমিক হিসেবে এবং পরে ক্রেতা হিসেবে। শুধু সেই জায়গাগুলো অপেক্ষাকৃতভাবে বিজ্ঞাপনের প্রচারণামুক্ত, যেখানে অত্যন্ত ধনীরা বসবাস করেন, তাদের অর্থবিত্ত শুধু তাদের জন্যই সুরক্ষিত।

সকল বিজ্ঞাপন প্রচারণা কাজ করে অনিশ্চয়তাবোধ আর উদ্বেগের উপর। সবকিছুর যোগফল হচ্ছে অর্থ, অর্থ উপার্জন করা মানে উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তাকে জয় করা।

বিকল্পভাবে যে অনিশ্চয়তার উপর বিজ্ঞাপন প্রচারণা তার কাজ করে তা হচ্ছে ভয় বা শঙ্কা, কোনো কিছু না থাকার কারণে আপনিও কোনো কিছু না, মূল্যহীন হবেন।

অর্থবিত্ত হচ্ছে জীবন। সেই অর্থে না যে, টাকা না থাকলে আপনি উপোষ করবেন। সেই অর্থে না যে, মূলধন কোনো একটি শ্রেণিকে অন্য একটি শ্রেণির পুরো জীবনের উপর কতৃর্ত্ব স্থাপন করবার ক্ষমতা দেয়। বরং এই অর্থে, টাকা হচ্ছে মানুষের সকল ক্ষমতার চিহ্নরূপ এবং একটি চাবি। টাকা খরচ করবার শক্তি হচ্ছে বাঁচার শক্তি। বিজ্ঞাপন প্রচারণার কিংবদন্তীর কাহিনী অনুযায়ী, যাদের টাকা খরচ করবার কোনো ক্ষমতা নেই, তা রা আক্ষরিক অর্থের অবয়বহীন অদৃশ্যে রূপান্তরিত হয়। আর যাদের সেই ক্ষমতা আছে, তারা ভালোবাসাযোগ্য হয়ে ওঠে ।

বিজ্ঞাপন প্রচারণা ক্রমবর্ধমান হারে যৌনতাকে ব্যবহার করছে কোনো দ্রব্য বা সেবা বিক্রয় করবার জন্য। কিন্তু এই যৌনতা কখনোই নিজ থেকে 'স্বাধীন' নয়; এটি একটি প্রতীক, যা এর চেয়ে বড় কোনো কিছুকে প্রতিনিধিত্ব করছে বলে ধারণা করা হয়: সেই স্বচ্ছল জীবন, যেখানে আপনি যা চান তা কিনতে পারবেন। কোনো কিছু ক্রয় করতে পারার ক্ষমতা হচ্ছে যৌন আকর্ষণীয় হবার মত একই রকম একটি ব্যপার; কখনো কখনো বিজ্ঞাপন চিত্রের সরাসরি এটি হচ্ছে বার্তা, যেমনটি উপরের বার্কলে কার্ডের বিজ্ঞাপনটির মত। সাধারণ বার্তাটি পরোক্ষ, যেমন, আপনি যদি এই দ্রব্যটি ক্রয় করতে পারেন তাহলে আপনি ভালোবাসার যোগ্য হয়ে উঠবেন আর আপনি যদি না ক্রয় করতে পারেন তাহলে আপনি অপেক্ষাকৃত কম ভালোবাসার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

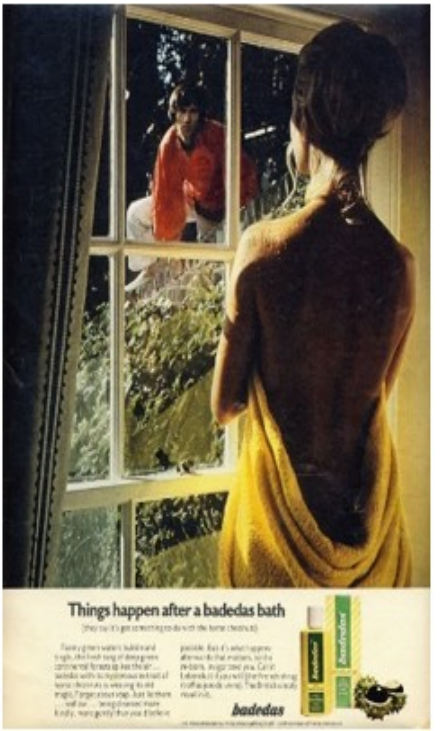

বিজ্ঞাপন প্রচারণার জন্য 'বর্তমান' হচ্ছে সংজ্ঞানুযায়ী অসম্পূর্ণ আর অপূর্ণ, যা যথেষ্ট নয়। তৈলচিত্রকে ভাবা হতো একটি স্থায়ী কোনো রেকর্ডের মত। কোনো তৈলচিত্রের অন্যতম যে সুখকর বিষয়টি এর মালিককে অনুভব করবার সুযোগ দেয় তা হলো সেই চিন্তাটি, এই চিত্রটি তার বর্তমান সময়ের দৃশ্যকল্পটি ভবিষ্যতে তার উত্তরসূরীদের দেখার একদিন সুযোগ করে দেবে। সে কারণে তৈলচিত্র আঁকা হতো 'বর্তমান' সময়ের পরিসীমায়। একটি চিত্রশিল্পী তার সামনে যা আছে, সেটি প্রকাশ করতেন তার চিত্রকর্মে, যা বাস্তবে আছে বা যার অস্তিত্ব কল্পনায়। বিজ্ঞাপনের প্রচারণার চিত্র যা ক্ষণস্থায়ী, তারা শুধু ভবিষ্যত ক্রিয়াকালকেই ব্যবহার করে মাত্র। এই পণ্যটি ক্রয় করলে আপনি আরো কাঙ্খিত হয়ে 'উঠবেন', আর এই পরিবেশের আবহে আপনার সব সম্পর্কই সুখকর, উচ্ছাসময় আর প্রাণচঞ্চল 'হবে'।

বিজ্ঞাপন প্রচারণা যা প্রধানত শ্রমিক শ্রেণি বা কর্মজীবি মানুষকে সম্বোধন করে প্রচারিত হয়, সেটি তাদের ব্যক্তিপর্যায়ে কোনো রূপান্তরের প্রতিজ্ঞা করে এবং যা শুধু সম্ভব কোন একটি নির্দিষ্ট পণ্যের বিশেষ ক্রিয়ার মাধ্যমে, যা সেই বিজ্ঞাপন প্রচারণাটি বিক্রয় করবার চেষ্টা করছে (ঈরহফবৎবষষধ); মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতি নির্দেশিত বিজ্ঞাপন প্রচারণা প্রতিজ্ঞা করে নানাবিধ সম্পর্কের উন্নয়নমুখী রূপান্তর যা কেবল সৃষ্টি করতে পারে একগুচ্ছ পণ্যসামগ্রী সমন্বয়ে সৃষ্ট কোনো সাধারণ পরিবেশ।

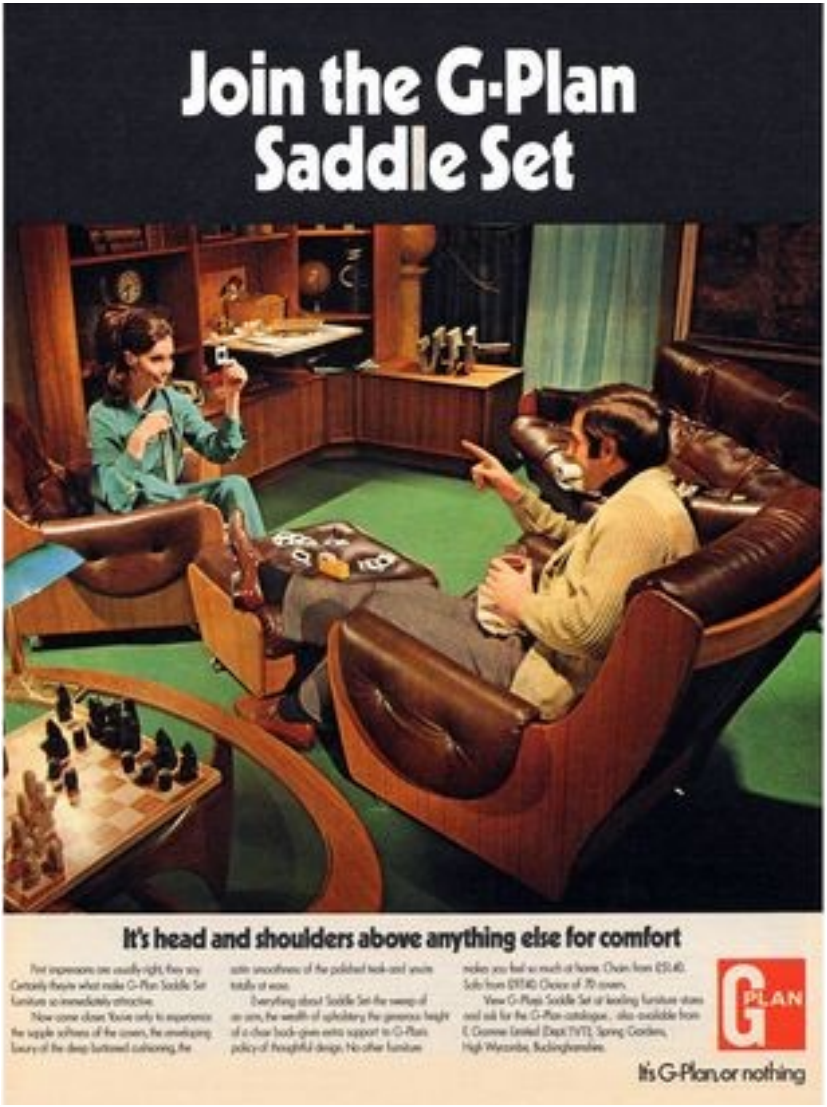

বিজ্ঞাপন ভবিষ্যত ক্রিয়াকাল ব্যবহার করে কথা বলে, কিন্তু তারপরও প্রতিশ্রুত সেই ভবিষ্যৎ অর্জনের প্রক্রিয়াটি নিরন্তরভাবে পিছিয়ে যেতে থাকে। কীভাবে তাহলে বিজ্ঞাপন প্রচারণা তাদের বিশ্বাসযোগ্যতার ধরে রাখে, বা যথেষ্ট পরিমান বিশ্বাসযোগ্য থাকে তার প্রভাবগুলো খাটানোর জন্য? এটি বিশ্বাসযোগ্য থাকে কারণ কোনো বিজ্ঞাপন প্রচারণার সত্যতা, তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারছে কি বা পারছে না, সেই মাপকাঠিতে বিচার করা হয় না বরং এটি যে কল্পনা প্রতিজ্ঞা করে, তা দর্শক—ক্রেতার কাছে সেটি কতটুকু প্রাসঙ্গিক তার উপর নির্ভর করে। এর সত্যিকার প্রয়োগ বাস্তবে না না বরং দিবাস্বপ্নে।

এই বিষয়টি ভালো করে বোঝার জন্য আমাদের অবশ্যই আবার সেই আকর্ষণীয় মোহময়তা বা গ্ল্যামারের ধারণায় ফিরে যেতে হবে।

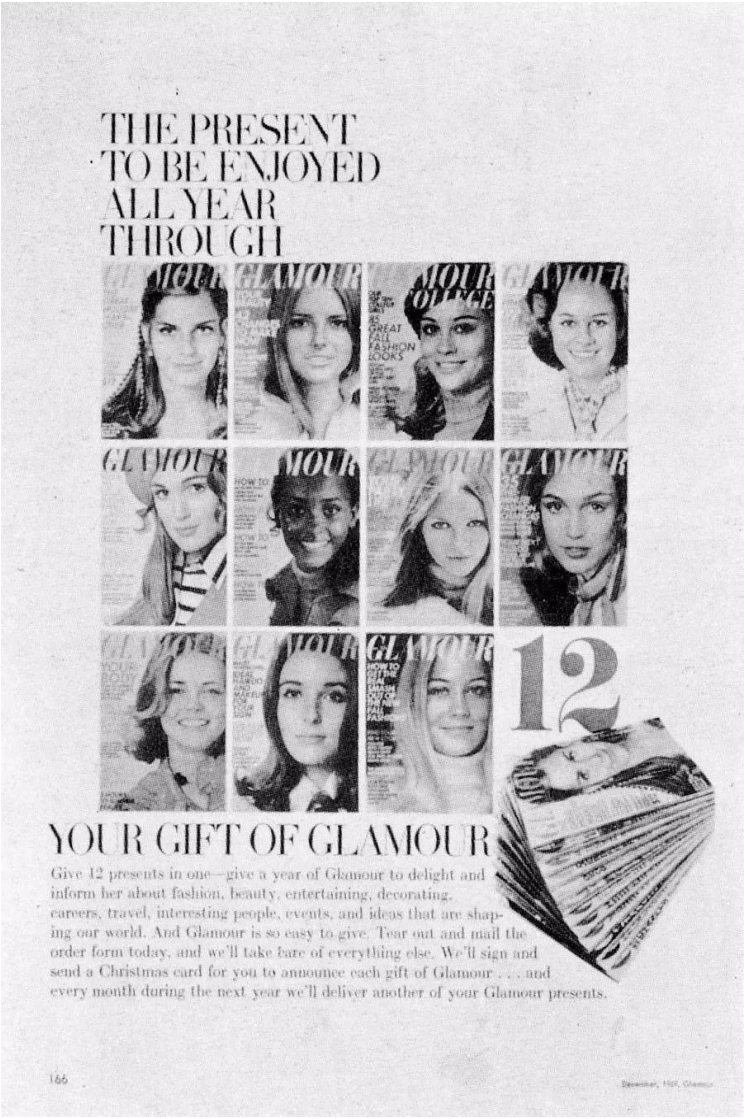

গ্ল্যামার হচ্ছে একটি আধুনিক উদ্ভাবন। তৈলচিত্রের স্বর্ণযুগে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আভিজাত্য, সৌন্দর্য কিংবা কর্তৃত্বের ধারণাগুলো আপাতদৃষ্টিতে তার সমতুল্য মনে হলে তারা কিন্তু আসলেই মৌলিকভাবে ভিন্ন।

গেইনসবরোর মিসেস সিডনস

মিসেস সিডন, তাকে যেমন করে শিল্পী গেইনসবরো দেখেছিলেন, আকর্ষণীয় আর মোহনীয় নয়, কারণ এখানে তাকে ঈর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা হয়নি এবং সেই কারণে তিনি সুখী। তাকে দেখে মনে হতে পারে, তিনি বিত্তশালী, সুন্দরী, প্রতিভাবান এবং ভাগ্যবতী, কিন্তু তার এই গুণাবলি শুধু তার নিজের এবং সেভাবে সেটি চিহ্নিত আর শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি কে, তা কিন্তু অন্যরা তার মত হতে চাইছে এমন কোনো কিছুর উপর পুরোপুরি নির্ভর করে না। তিনি শুধুমাত্র 'অন্যদের' ঈর্ষার পাত্রী নন - আর সেভাবেই, যেমন, অ্যান্ডি ওয়ারহোল মেরিলিন মনরোকে উপস্থাপন করেছেন।

(অ্যান্ডি ওয়ারহোল, মেরিলিন মনরো)

গ্ল্যামার বা মোহময়তার কোনো অস্তিত্ব থাকত না, যদি না ব্যক্তিগত আর সামাজিক ঈর্ষা খুব স্বাভাবিক এবং সর্বব্যাপী একটি অনুভূতি না হতো। শিল্পন্নোত দেশগুলোর সমাজ গণতন্ত্র অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিল কিন্তু তারপর হঠাৎ তাদের সেই অগ্রযাত্রা স্থগিত হয়েছে মাঝপথে, সৃষ্টি করেছে এই ধরনের আবেগ সৃষ্টি হবার জন্য একটি আদর্শ সমাজ। ব্যক্তিগতভাবে নিজের সুখের অনুসন্ধান করা আর সংগ্রাম করা ইতিমধ্যেই স্বীকৃত হয়েছে সর্বজনীন একটি অধিকার হিসেবে।

কিন্তু তারপরও বিদ্যমান সমাজ কাঠামো ও পরিস্থিতিতে মানুষ অসহায়ভাবে তার ক্ষমতাহীনতাই অনুভব করে । সে বর্তমানে যা, আর সে যা হতে চায় এমন একটি পরস্পর বিরোধী পরিস্থিতিতে তার বসবাস। এর প্রতিক্রিয়ায় সে পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠে এই পরস্পর বিরোধী পরিস্থিতি ও তার কারণ সম্বন্ধে এবং সুতরাং সে যোগদান করে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক সংগ্রামে। যে গণতন্ত্র তার বহু প্রতিশ্রুতি ছাড়াও পুঁজিবাদের উৎখাত হবে এমন প্রতিশ্রুতিও দেয়। অথবা সে বেঁচে থাকে সারাক্ষণই একটি ঈর্ষায় আক্রান্ত হয়ে, যা তার ক্ষমতাহীনতার বাস্তবতাকে আরো জটিল করে তোলে, বারংবার দিবাস্বপ্নে তাড়িত হবার বাস্তবতায় তা বিলীন হয়ে যায়।

বিজ্ঞাপন প্রচারণা কীভাবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রাখতে পারে সেটি বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর করে তোলে এই বিষয়টি। বিজ্ঞাপন প্রচারণা যা আসলে নিবেদন করে বলে প্রচার করে এবং যে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি সেটি দেয়, এ দুটির মধ্যবর্তী শূন্যস্থান, একজন দর্শক—ক্রেতা তার নিজের সম্বন্ধে যা অনুভব করে আর যেখানে সে নিজেকে দেখতে চায় সেটি সেই শূন্যস্থানটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। দুটি শূন্যস্থান একীভূত হয়ে যায়: দুটো শূন্যস্থানের মধ্যে কোনো ক্রিয়া বা যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতার সেতু বন্ধন সৃষ্টি না হবার বদলে এই শূন্যস্থানটি পূর্ণ হয় মোহময় আকর্ষণীয় দিবাস্বপ্ন দিয়ে।

আর এই পক্রিয়াটিকে প্রায়শই আরো দৃঢ়ীকরণ করে কর্মস্থলের কাজ করবার পরিবেশ।

অর্থহীনভাবে কাজ করার সময়ের অন্তহীন বর্তমানের 'ভারসাম্য' রক্ষা করে একটি স্বপ্নদৃষ্ট ভবিষ্যত, যেখানে কল্পিত কর্মকাণ্ডগুলি বাস্তব সেই বর্তমান মুহূর্তের নিষ্ক্রিয়তা প্রতিস্থাপিত করে। নারী বা পুরুষ, যে কারোরই দিবাস্বপ্নে কোনো নিষ্ক্রিয় শ্রমিক সক্রিয় ভোক্তায় রূপান্তরিত হয়। নিজের কর্মরত শ্রমক্লান্ত সত্তা নিজেরই ভোক্তা সত্তাকে ঈর্ষা করে।

কোনো দুটি স্বপ্ন হুবহু এক নয়। কোনোটি তাৎক্ষণিক, কোনোটি দীর্ঘমেয়াদী। প্রতিটি স্বপ্নদ্রষ্টার কাছে সবসময়ই তার নিজের স্বপ্ন ব্যক্তিগত। বিজ্ঞাপন প্রচারণা কোনো স্বপ্ন সৃষ্টি করতে পারেনা। এটি যা করতে পারে তাহলো, আমাদের মন্ত্রণা দেয়া, আমাদের প্রত্যেকের কাছে সে প্রস্তাব করে, আমরা এখনো ঈর্ষার যোগ্য হয়ে উঠিনি, কিন্তু আমরা তা হতে পারি।

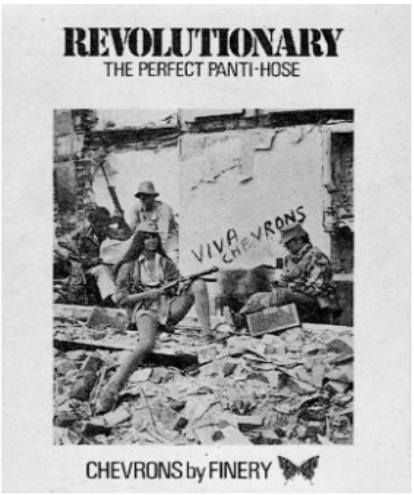

বিজ্ঞাপন প্রচারণার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ক্রিয়া আছে। বিজ্ঞাপন প্রচারণা যারা তৈরি করেছে বা যারা ব্যবহার করে, এই সামাজিক ক্রিয়াটি প্রচারণার উদ্দেশ্য হিসেবে তাদের পূর্বপরিকল্পিত নয়, এই বাস্তব সত্যটি সেই সামাজিক ক্রিয়াটির গুরুত্ব কোন অংশে হ্রাস করে না। বিজ্ঞাপন প্রচারণা ভোগবাদীতাকে গণতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কে কি খাবে (বা পরিধান করবে বা চালাবে) সেই পছন্দটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তর জায়গা দখল করে নিয়েছে। বিজ্ঞাপন প্রচারণা সমাজের সব কিছু যা অগণতান্ত্রিক, সেই বিষয়গুলোকে ছদ্মাবরণে ঢেকে রাখতে সাহায্য করে ও ক্ষতিপুরণ দেবার চেষ্টা করে এবং এটিও ছদ্মাবরণের মুখোশ পরিয়ে দেয় সারাবিশ্বে যা ঘটছে সেই বাস্তবতার উপরেও।

বিজ্ঞাপন প্রচারণা এক ধরনের দর্শন নির্ভর পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত হয়। এটি সব কিছু তার নিজের মত করেব্যাখ্যা করে । সারা বিশ্বকে সে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করে ।

সারা পৃথিবী সেই মঞ্চের বা পটভূমির অংশ হয়, বিজ্ঞাপন প্রচারণা যেখানে সুন্দর জীবনের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবার আশ্বাস দেয়। সারা পৃথিবী আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। যেন এটি আমাদের কাছে নিজেকে নিবেদন করছে এবং যেহেতু প্রতিটি জায়গাই আমরা এমনভাবে কল্পনা করি যে তারা নিজেদের নিবেদন করছে আমাদের প্রতি, সেই কারণে সব জায়গা কম বেশি একই রকম অনুভূত হয়।

বিজ্ঞাপনের প্রচারণা অনুযায়ী, অভিজাত ও সভ্য হতে গেলে সব ধরনের সংঘর্ষকে এড়িয়ে চলতে হবে।

বিজ্ঞাপন প্রচারণা এমনকি বিল্পবকে তারা নিজের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করে।

বিজ্ঞাপনচিত্রের পৃথিবী সম্বন্ধে ব্যাখ্যা এবং পৃথিবীর সত্যিকার রূপের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি মাত্রায় সুস্পষ্ট এবং মাঝে মাঝে রঙ্গীন পত্রিকাগুলোয় বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, যারা নানা ধরনের খবর পরিবেশন করে থাকে। এমন একটি পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্রটি দেখুন নীচে।

এখানে দুটির ছবির মধ্যে এই ধরনের পার্থক্যগুলো আমাদের যেভাবে নাড়া দেয়, সে বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষভাবে বিবেচনার দাবি রাখে : এমন নয় যে এখানে দুটি ভিন্ন পৃথিবীর সহাবস্থানকে প্রদর্শন করা হচ্ছে বরং আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ

হচ্ছে, সংস্কৃতির বিদ্যমান নৈরাশ্যবাদীতা, যা চিত্র দুটিকে একটার উপর আরেকটা সাজিয়ে পাঠকদের জন্য প্রকাশ করেছে। তর্ক করা যেতে পারে যে, এই ছবি দুটোকে কাছাকাছি এভাবে সজ্জিত করে প্রকাশ করা পূর্বপরিকল্পিত নয়।

তাসত্ত্বেও এখানে যে টেক্সট বা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, পাকিস্তানে তোলা আলোকচিত্রগুলো এবং বিজ্ঞাপনের জন্য তোলা আলোকচিত্রগুলো, ম্যাগাজিনটির সম্পাদনা, বিজ্ঞাপনচিত্রগুলোর এই পৃষ্ঠায় তাদের সজ্জা, একই সাথে দুটো আলোকচিত্র প্রকাশ এবং সেই সত্যটি যে, বিজ্ঞাপনদাতার পৃষ্ঠা আর সংবাদের পৃষ্ঠার মধ্যে সঠিক সমন্বয় সম্ভব না, এই সবকিছু একই সংস্কৃতির সৃষ্টি।

যদিও নৈতিক ধাক্কা যা কেউ অনুভব করতে পারেন এই চূড়ান্ত বৈসাদৃশ্যতায়, তার উপর গুরুত্ব আরোপ করবার কোনো প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞাপন নিজেই এই ধাক্কা দেবার জন্য পুরো দায়বদ্ধতা নিতে পারে। 'দি অ্যাডভার্টাইজিং উইকলি' (৩ মার্চ ১৯৭২) জানাচ্ছে যে, কিছু বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান, এখন এই ধরনের কোনো দুর্ভাগ্যজনক খবরের সাথে তাদের বিজ্ঞাপনগুলো সহপ্রকাশ হবার মতো বিপদের সম্ভাবনার ব্যাপারে সচেতন। সেই লক্ষ্যে তারা আরো গম্ভীর, অনেক বেশি মার্জিত আর প্রায়ই রঙ্গীনের বদলে সাদাকালো আলোকচিত্র ব্যবহার করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের যেটা অনুধাবন করতে হবে সেটা হচ্ছে, এই ধরনের কোনো বৈসাদৃশ্যময় পরিস্থিতিতে বিজ্ঞাপন প্রচারণার সত্যিকার স্বরুপটাকে।

বিজ্ঞাপন মূলত কোনো 'ঘটনাবিহীন'। কোনো কিছুই ঘটছে না সেই অবধি এটি নিজেকে বিস্তৃত করতে পারে। বিজ্ঞাপন প্রচারণার জন্য সব সত্যিকার ঘটনাই ব্যতিক্রম এবং যা ঘটে শুধুমাত্র অগান্তুকদের জীবনে। বাংলাদেশের এই আলোকচিত্রে যা ঘটছে তা খুবই মর্মান্তিক, এবং তা ঘটছে বহু দূরে। কিন্তু এই বৈসাদৃশ্য কোনো অংশেই চোখে না পড়বার মত হতো না, যদি ঘটনাটি ঘটতো কাছে, যেমন ডেরি বা বার্মিংহামে। এবং এই বৈসাদৃশ্যতা কিন্তু এমন না যে ঘটনাটি মর্মান্তিক, সেই বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হবে। যদি তারা মর্মান্তিক হয় তাহলে সেটি আমাদের নৈতিকতাবোধকে এই বৈসাদৃশ্যতার প্রতি সতর্ক করে তোলে এবং এমনকি ঘটনাগুলো যদি আনন্দপূর্ণও হয় এবং যদি তাদের আলোকচিত্রও তোলা হয়ে থাকে প্রত্যক্ষভাবে, এবং কোনো ধরনের পূর্বধারণাপুষ্ট না হয়ে , তারপরও সেই বৈসাদৃশ্যটা একই রকম বিশাল থাকতো।

বিজ্ঞাপন প্রচারণার প্রতিশ্রুতির অবস্থান নিরন্তর পিছিয়ে দিতে থাকা দূর ভবিষ্যতে, যা বর্তমান পরিত্যাগ করে, এভাবে সে বর্জন করে সব কিছু হয়ে ওঠাকে, সব অগ্রগতিকে। যার ভিতরে কোনো ধরনের অভিজ্ঞতাই অসম্ভব। সব কিছু যা ঘটে, তা ঘটে এর বাইরে।

বিজ্ঞাপন প্রচারণা যে ঘটনাহীন এই সত্যটা তাৎক্ষণিকভাবেই স্পষ্ট হয়ে যায় যদি না সেটি এমন কোনো ভাষা ব্যবহার না করে থাকে, যা কোনো একটি ঘটনাকে বোধগম্য করে তোলে তার নিজের মধ্যেই। যা কিছু বিজ্ঞাপনচিত্র দেখায়, তাদের সবাই অপেক্ষা করছে অধিগ্রহণের অপেক্ষায়। এই অধিগ্রহণ করবার প্রক্রিয়াটি বাকি অন্য সব

কাজের অনেক উপরে জায়গা করে নেয়, কোনো কিছু পাবার সেই অনুভূতি আর সব অনুভূতিতে গ্রাস করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

বিজ্ঞাপন প্রচারণার সুবিশাল একটি প্রভাব আছে আর এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ও বটে। তবে এটি যা নিবেদন করবার প্রতিজ্ঞা করছে তার সীমানা যতটা সংকীর্ণ, ঠিক ততটাই বিস্তৃত এটি প্রতিশ্রুতির সাথে যেসব সংযোগসূত্রগুলোর ইঙ্গিত দেয়। কোনো কিছু অধিগ্রহণ করবার শক্তি ব্যতীত আর কোনো কিছুকে এটি মূল্য দেয় না। অন্য সব মানবিক বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয়তাগুলো এই ক্ষমতার অধীনে ন্যস্ত হয়। সব আশাকে জড়ো করা হয়, তাদের সমরূপী আর সরলীকৃত করা হয়, সুতরাং তারা তীব্র হয় ঠিকই তবে অস্পষ্ট, বিস্ময়করভাবে মোহাবিষ্ট করবার মত, তবে প্রতিটি ক্রয়ের সাথে পুনরাবৃত্তিযোগ্য প্রতিজ্ঞা নিবেদন করা হয়। আর কোনো ধরনেরই আশাবাদ বা সন্তুষ্টি বা আনন্দ এ ধরনের পুঁজিবাদের সংস্কৃতিতে মধ্যে কল্পনা করা সম্ভব হয় না।

বিজ্ঞাপন প্রচারণা হচ্ছে এই সংস্কৃতির প্রাণ - এমন গভীর সেই সম্পর্ক যে বলা যেতে পারে বিজ্ঞাপন প্রচারণা ছাড়া পুঁজিবাদ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না - এবং একই সাথে বিজ্ঞাপন প্রচারণা হচ্ছে পুঁজিবাদেরই স্বপ্ন।

পুঁজিবাদ টিকে থাকে, যাদের এটি শোষণ করে, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠকে তাদের নিজস্ব স্বার্থগুলো যতটা সংকীর্ণভাবে সম্ভব সেভাবে সংজ্ঞায়িত করতে বাধ্য করে। একসময় এই কাজটি করা হয়েছিল ব্যাপক বঞ্চনার মাধ্যমে। আজ উন্নত দেশগুলোতে কোনটি কাঙ্ক্ষিত আর কোনটি নয় তার একটি মিথ্যা মানদণ্ড আরোপ করবার মাধ্যমে সেটাই অর্জিত হয় ।

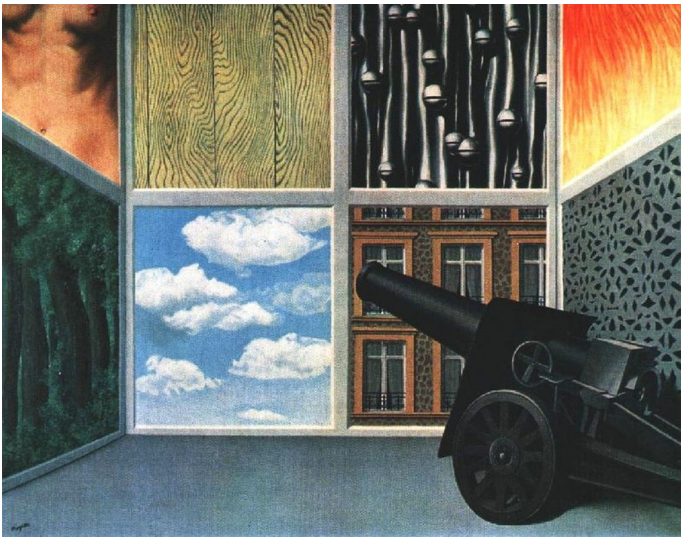

রেনে ম্যাগ্রিটের অন দ্য থ্রেশহোল্ড অব লিবার্টি